সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিপন্ন পুরুষ

Pathagar

adhy

বিপন্ন পুরুষ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী /কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-8437-140-6

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০১২

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
তারকেশ্বর প্রেস
৬ নং শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

শব্দগ্রন্থন ঃ
প্রদীপ্তা লেজার
১/৫ তারণকৃষ্ণ নস্কর লেন,
কলকাতা—১০

প্রচ্ছদ ঃ
রঞ্জন দত্ত

মূল্য ঃ ৭০.০০

উৎসর্গ

সুকান্ত সাহা
মিনতি সাহা
স্নেহভাজনেষু

মানুষের পুরুষ প্রজাতির জীবনে গভীর এক সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে। আসিতেছে বলি কেন, আসিয়াই গিয়াছে। নিজেদের নিয়তি তাহারা হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টায় নিজেরাই রচনা করিয়াছে। বহু প্রচলিত প্রবাদেই আছে—কাষ্ঠ ভক্ষণ করিলে অঙ্গার রূপ মল ত্যাগ করিতেই হইবে। পঞ্চতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যেমন কর্ম তেমন ফল।

সেদিন এক গ্রন্থে মানবজাতির অতীত ইতিহাস পাঠ করিতেছিলাম। উক্ত গ্রন্থে একটি চিত্র মুদ্রিত দেখিলাম। দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলাম। কিয়দ্দূরে আমার আধুনিকা স্ত্রী রাত্রির আহারের জন্য 'ম্যাগি' নামক 'চটজলদি' একটি আহার্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। সুস্বাদু না হইলেও উদরপূর্তির পক্ষে যথেষ্ট। স্বসঞ্চালিত পিচ্ছিল কিঞ্চলুক জাতীয় পদার্থ। জিহ্বাগ্রে স্থাপন করিবামাত্র হড়াস করিয়া হড়কাইয়া উদরে সাঁদ হইয়া যায়। অতীতে আমার মাতার কালে বহু জাতীয় অপ্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনে তিতিবিরক্ত হইতাম। অতি সুস্বাদু সেই সব পদ আমাদিগকে জিহ্বার দাসে পরিণত করিয়াছিল। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইতে রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত কেবলই আহার, কেবলই আহার। বাল্যকাল হইতেই যুগপৎ আহার ও বেধড়ক প্রহারের পথ ধরিয়া যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি। তৎকালে আমার পিতৃদেব সুযোগ পাইলেই আমার মাতাকে মসৃণ করিবার জন্য বলিতেন—'সুধাকে আমি একটি মাত্র কারণে বিয়ে করেছি, সে হল ওর রান্না। মহাভারতের কুন্তী মরে সুধা হয়ে জন্মেছে।'

এই সামান্য শুদ্ধ প্রশংসায় আমার মাতৃদেবী মার্জারের মতো ঘড়ঘড় শব্দ করিতেন ও কঠিন কোনও বিশেষ একটি পদ প্রস্তুত করিয়া এই প্রশংসার প্রতিদান হিসাবে আমাদের রসনাকে উল্লসিত করিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, সামান্য পটলের অসামান্য রূপান্তর। পটলের আকৃতি 'মিনিয়েচার' মৃদঙ্গের মতো। আপনারা অবশ্যই লক্ষ করিয়া থাকিবেন। তাহার একটি দিক সামান্য ছেদন করিয়া, গর্ভস্থ আবর্জনাদি শলাকা সহায়ে বাহির করিয়া, অত্যন্ত সুকৌশলে সেই শূন্য উদরে বিশেষ কায়দায় প্রস্তুত পুর ভরিতেন। এই পুর ডাল অথবা মৎস্য দ্বারা তৈয়ার হইত। পুর ভরিবার পর পটলের কর্তিত অংশে সেই কর্তিত চাকলাটিই 'প্লাস্টিক সার্জারি'র কায়দায় সংযুক্ত করা হইত। অতঃপর কড়াইয়ের সরিষার তৈলের উত্তপ্ত প্রস্রবণে নিমজ্জিত ভর্জনে মুচমুচে করিয়া পাতে পাতে পরিবেশন করিতেন। এক একজনে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ

Pathagar

করিয়া, দুই, দশটা খাইয়া ফেলিতেন। দুই কুড়ি দশ এই প্রকার অ্যাটম বোমা তৈয়ার করিতে আমার মাতাকে কী পরিমাণ পরিশ্রম ও সময় নিয়োগ করিতে হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পটলের গর্ভ উৎপাটন করিয়া গর্ভস্থাপন। 'হার্ট ট্রানসপ্ল্যান্ট'-ও বলা যাইতে পারে। আমাদের পরিবারস্থ সকলের এবংবিধ সুখ সঞ্চারে নিজেকে অকাতরে নিবেদনের ফলে নৈবেদ্যটি অকালে অসুস্থ হইয়া সকাল সকাল পরলোকে প্রস্থান করিলেন। মাতৃহীন শোকসন্তপ্ত পরিবার অতঃপর চরম বিশৃঙ্খলার শিকার হইয়া স্বীকার করিল রবার টানিলে বর্ধিত হয় অবশ্যই ; কিন্তু বেশি টানিলে ফটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যায় ও ভিটায় মহানন্দে ঘুঘু চরিতে থাকে।

মনু মহারাজ একালের জিনস, স্ন্যাকস, ফতুয়া পরিহিতা, ওষ্ঠে সিগারধারিণী বিদুষী রমণীদের আগমনবার্তা শ্রবণ না করিয়া মহানন্দে এক বিধান দিয়া আমাদের গালাগালি খাইবার পথ আরও প্রশস্ত করিয়া গেলেন। মনু ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। একাধিক মনুকে লইয়া দূর দূর অতীতে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। It is the designation of an office. তাঁহারাই অরণ্যের অনগ্রসরতায় বসিয়া যাবতীয় বিধান দিতেন। আর তৎকালের মানুষ 'ঋষিরুবাচ' বলিয়া মানিতে বাধ্য হইতেন। যেমন একালের গ্রামপঞ্চায়েতের বিধানে নারীকে ডাইনি আখ্যা দিয়া কিলাইয়া, ঢিলাইয়া, পুড়াইয়া মারার সংবাদ দৈনিকে প্রকাশিত হয়। আইনের প্রতিবাদ একালেও মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

মনু নারী সম্পর্কে কী কহিলেন!—

'বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চি ৎ কার্যং গৃহেস্বপি।।
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম।।'

আমি ব্যাখ্যা করিতেছি, 'নারী বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বৃদ্ধাই হউন, গৃহের কোনও কার্যে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না। নারী বাল্যে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামী মৃত হইলে পুত্রের বশে থাকিবে—কদাচ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না।' অন্যত্র এই একই কথা পুনরায় আবার বলিলেন অন্যভাবে—

'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।'

নারীকে কৌমারে পিতা, যৌবনে পতি এবং স্থবিরে পুত্রেরা রক্ষা করিবে। স্বাতন্ত্র্য নারীর পক্ষে ভাল নহে।

ধোলাইকৃত এই মগজ লইয়া পরিবারে পরিবারে কন্যাদেরও মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা প্রবাহের মতোই চলিয়া আসিতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, মাতারাই কন্যাকে সর্বাধিক শাসন করিয়া থাকেন। নারী-স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী মাতারাই। বাল্যে দেখিয়াছি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী পেয়ারাতরুতে আরোহণ করিয়া ডালপালা ভাঙিয়া, কোনও একটি শাখায় শাখামৃগীর মতো পদদ্বয় প্রলম্বিত করিয়া মনের সুখে কষকষ করিয়া পেয়ারা চিবাইয়া থু থু করিয়া ফেলিত, তখন আমার মাতা রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করিয়া বলিতেন, 'মনে রাখিস শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। মদ্দা মেয়েকে কেউ নেবে না। বছর না ঘুরতেই নড়া ধরে বাপের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে যাবে।' পরবর্তীকালে সবিস্ময়ে লক্ষ করিলাম দিদি মা হইবার পর তাহার কন্যাকে ধিঙ্গি বলিয়া তিরস্কার করিতেছে ও ভবিষ্যতে শ্বশুরালয়ে তাহার কী দুরবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া কপাল চাপড়াইতেছে। পতিব্রতা পতিরতা অবিরত সুশীলতা, এই ছিল নারীর আদর্শ।

প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি, যে-পুস্তকটি উলটাইতেছিলাম, তাহা হইল মানুষের ইতিহাস। যে-চিত্রটি দেখিয়া অধোবদন হইয়াছিলাম, তাহা এইরূপ— বল্কলধারী এক ভয়ঙ্কর অমার্জিত পুরুষ, অর্ধোলঙ্গ এক নারীর কেশ আকর্ষণ করিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। রমণী ভূপতিত। পুরুষটি বন্য। শ্মশ্রু, গুম্ফ ও কেশের জটাজালে মুখ প্রায় অদৃশ্য। দুইটি দন্ত বাহির হইয়া আছে। এক হস্তে প্রস্তরনির্মিত কুঠার। প্রস্তরযুগের দৃশ্য। পুরুষটির শরীরের বন্য দুর্গন্ধ আমার ঘ্রাণে আমি পাইতেছি। কোলনযুক্ত আধুনিক সাবানে গাত্রমার্জনা করিয়া একটি জিনসের প্যান্ট ও ঢিলাঢালা টিশার্ট পরাইয়া হাতে একটি গীটার ধরাইয়া দিলে একালের বিটলস হইতে পারিত। রমণীটিকে তেমনভাবে সাজাইতে পারিলেই একালের 'ব্লক বাস্টার' হিন্দি ছায়াছবির ধর্ষিতা নায়িকা। সামান্য রকমফের করিতে পারিলেই চরিত্র দুটি আর্টের মর্যাদা পাইত অবশ্যই। আমাকেও অধোবদন হইতে হইত না ; কিন্তু উহা তো আর্ট নহে। আদি মানবের জীবন। ক্ষণকাল পূর্বে কাঁচা শূকরের মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। তাহার পরে কামতাড়িত হইয়া কোনও এক গোষ্ঠীর স্ত্রীলোকটিকে বাহুবলে ঘষড়াইতে ঘষড়াইতে লইয়া চলিয়াছে। ইহা রিরংসা। ওই পুরুষটিই তো কালের পথ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে 'নরসুন্দর সেলুনে' আসিয়া চুলে 'দশ আনা ছ আনা',

অথবা ক্রুকাট মারিতে বলিতেছে। 'টুইন ব্লেড' দিয়া দাড়ি কামাইয়া 'আফটার শেভ' মাখিতেছে। 'ব্যাগি' চড়াইয়া 'মোটরবাইক' হাঁকাইয়া বহুতল বাড়ির উচ্চতলে, শীতল কক্ষে বসিয়া 'কম্পুটার' নামক যন্ত্রে দশআনা ছআনা করিতেছে। ওই পুরুষটিই তো মাঘের শুভ সন্ধ্যালগ্নে, যদিদং মদিদং বলিয়া কোনও এক তন্বী শ্যামাশিখরী দশনাকে কেশাকর্ষণে না হউক গাঁটছড়া বাঁধিয়া যন্ত্রযানে গাদাই করিয়া 'ফ্ল্যাট' নামক খাঁচায় আনিয়া চিরকালের জন্য বন্দি করিতেছে। 'লক-স্টক-ব্যারেল' সহ উৎপাটন। সমস্ত 'আইডেনটিটির' উৎসাদন। দত্ত বসু হইয়া যাইতেছে, বসু বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেছে। পূর্বের পরিবেশ ভুলিয়া শ্বশুরালয়ের পরিবেশে অভ্যস্ত হইবার কসরত চালাইতেছে। সঙ্গে আনিয়া দিল ভরি ভরি স্বর্ণালঙ্কার, তাহা শাশুড়ি নামক এক আপাতমধুর কিন্তু আসলে একটি 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম'-এর কবজায় চলিয়া গিয়াছে। নগদ কেতার নোটসমূহে বাবাজীবন সানাইয়ের ফাটা রেকর্ড বাজাইয়া, ভূতভোজন করাইয়া ফুলশয্যা করিয়াছেন। জুঁই ও রজনীগন্ধার মালা শুকাইতে না শুকাইতেই নিজ অরণ্যমূর্তি ধারণ করিয়া, এই লে আও, সেই লে আও বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। বিএ পাঠরতা কুঁদুলে ননদিনী লাল পিঁপীড়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দংশন করিতেছেন। ব্যবসায় আরও টাকা ঢালিতে হইবে, অতএব আইস, কন্যাটিকে আচ্ছা করিয়া ধোলাই দেওয়া যাউক, তাহা হইলে শ্বশুরমহাশয় সোনার ডিম্ব পাড়িবেন। যদি দেখা যায় তাঁহার 'কনস্টিপেশান'-এর ফলে ডিম্ব বাহির হইতেছে না কিছুতেই, তখন একপাত্র কেরোসিন বধূর গায়ে ঢালিয়া দেশলাই মারিয়া দাও, উল্লাসে নৃত্য করো—'আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া কাল আমাদের দোল।' আদিম মানব প্যান্ট-শার্ট পরিয়াছে মাত্র, স্কচ সহযোগে বোনলেস খাইতেছে মাত্র, বায়ুযানে চড়িয়া বিলাতেও যাইতেছে, অঙ্গে বিলাতি পারফ্যুম ফ্যাঁস করিতেছে, ট্রেনের 'আপার বাঙ্কে' শুইয়া ইংরাজি পেপার ব্যাক পড়িতেছে, চিবাইয়া চিবাইয়া ইয়াঙ্কি ইংরাজি বলিতেছে, কিন্তু 'জিপ ফাস্টনার' টানিলেই বিপদ, বরাহ বাহির হইয়া পড়িবে। সংস্কার যাইবে কোথায়। রাক্ষসরা সাধে বলিত, হাঁউ মাঁউ খাঁউ মনিষ্যি গন্ধ পাঁউ। পুরুষ প্রজাতির মনুষ্যের উগ্র পাশব গন্ধ ইরানের সহস্র গোলাপের নির্যাসেও যাইবার নহে। বরাহ 'ডক্টরেট' হইলেও ডক্টর বরাহ ভিন্ন কিছু নহে। অবতার হইলেও বরাহ বরাহই।

আমার কথাতেই আবার ফিরিয়া আসি।

আমার ভবিতব্য স্ত্রীর সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে একদা পঠিতব্য [illegible] ছিলাম।

যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মে প্রথমে চক্ষুতে চক্ষুতে ঠোকাঠুকি, তৎপরে ঠোঁটের কোণে কোণে ফিচিক ফিচিক হাসি। অবশেষে সাহস কিঞ্চিৎ বাড়িবার পর 'ক্লাসে' প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় অঙ্গে অঙ্গ ঘর্ষণ।

বলিতে দ্বিধা নাই কসরত আমিই অধিক করিয়াছিলাম। জীবজগতের তাহাই নিয়ম। এক বর্ষার দ্বিপ্রহরে শান্তিনিকেতনে এক ময়ূরকে সারা বেলা পেখম মেলিয়া নাচিতে দেখিয়াছিলাম। নাচিতে নাচিতে তাহার পেখম খুলিয়া পড়িতেছিল, ময়ূরী কিন্তু দৃকপাত করিতেছিল না। নিষ্ঠুর রমণী 'চিউইংগাম' চিবাইতেছিল। ময়ূরের কষ্ট দেখিয়া আমিই বারকতক বলিলাম—'আই লাভ ইউ'। উদ্যানপালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! কবে মিলন হইবে! আদৌ হইবে তো!'

তিনি বলিলেন, 'হবে না মানে। আলবাত হবে। ছলা, কলা, ছোমা এই হল মেয়েদের ধর্ম। নাহলে ময়ূর, বাঘ, সিংহ, বেড়াল সব তো লোপাট হয়ে যেত।' জন্তু শ্রেণির স্ত্রী জাতির উদ্দেশে উদ্যানপালকের এবংবিধ মন্তব্যে একটি ক্ষোভ ছিল। পরে আমি রহস্য উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তাঁহার এই আকাট উষ্মার লক্ষ্যে ছিলেন এক নারী। গত তিন বৎসর ধরিয়া সেই মোহিনী ল্যাজে খেলিতেছেন, বিবাহবন্ধনে ধরা দিতেছেন না। সন্নিকটে আসিয়া আবার সরিয়া যান। সন্ধ্যাকালে পেটে দু-এক পাত্র পড়িবামাত্র তাঁহার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া গেল। তাঁহার প্রেমিকার নাম ছিল রোহিণী। আমি সেই নায়িকাকে দর্শনও করিয়াছিলাম। বলিতে দ্বিধা নাই, দেহবোধে আমিও অতিশয় কাতর হইয়াছিলাম। তখন আমার ঠোঁটে কবিতার পর কবিতা খেলা করিত। তখন আমিও প্রেম নামক দ্বাপরীয় দুর্বলতায় কাতর। নারীকে চিনিতে ও গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। এই বোধে উপনীত হইয়াছি —পৃথিবী মানে শ্যামল, সবুজ বৃক্ষরাজি, কলস্বনা নদী, নীল আকাশ, চন্দ্রকিরণ ও নারী। প্রেমের কারণেই আগমন। জমিয়া গেলে সংসার, ভাঙিয়া গেলেই আত্মহত্যা অথবা সমাজসেবা। সেই কারণেই রোহিণীকে দর্শন মাত্রেই রাম বসুর এক চরণ কবিতা ভিতরে গুড়গুড় করিয়া উঠিল। 'দেখল ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ফলসা-রঙা মেয়ে।' সেই মেয়েটি কেমন! না, 'জোয়ার-লাগা নদীর মতো ভরাট কূলে কূলে।' আমার মনে হইতেছিল, উদ্যানপালক গজেন মালিকে দ্বৈরথে পরাস্ত করিয়া রোহিণীকে লইয়া পলায়ন করি, পর্বতের সানুদেশে কুটির নির্মাণ করিয়া মেষপালন করি ও বাজরার রুটি খাই। তাহার কবরী বন্ধন, 'দাওয়ার খুঁটি দু'হাত ধরে স্বপ্ন দেখা মেয়ে।' শরীরের তরঙ্গ ভঙ্গ। তীর ছুড়িবার কায়দা, মদ্য

না পান করিয়াও দেহসুরায় মাতাল হইলাম,

'বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়, বাজল দূরে শাঁখ
নদীর বাঁকে শুনতে পেল চোদ্দ জয়ঢাক
চমকে দিয়ে বললে তারে, কনে
চন্দ্রহার গড়িয়ে দেব পৌষ-পারবণে।
নদীর কাছে দান চাইলাম, তোমায় পেলাম বৌ
তুমি আমার পদ্মবিলের মৌ।'

আমার সহপাঠিনীর প্রতি অন্য সহপাঠীদেরও খরদৃষ্টি ছিল। থাকিতেই পারে। পুরুষজাতি মক্ষিকার ন্যায়। কর্তিত ফল অথবা নিবেদিত মিষ্টান্ন অথবা মুদির দোকানে ভেলি গুড়ের বস্তার চারিপার্শ্বে ভ্যান ভ্যান করিবেই। এই মক্ষিকাদের অনেকেরই পুঁজির জোর বেশি থাকায় আমার উপর 'অ্যাডভানটেজ' লইবার চেষ্টায় ত্রুটি করে নাই। জোড়া জোড়া কাটলেট, ডবল ডবল আইসক্রিম ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী সহায়ে তাহারা একটা কিছু করিতে চাহিতেছিল। একটি এলোকেশী বার্তাকু, অথবা অলাবুতে, কিম্বা পেয়ারায় কীট প্রবেশ করিবেই। করিয়া, প্রেম করিবে না, কুরিয়া কুরিয়া খাইবে। ভোগ করিবে। নারী পুরুষদের এবংবিধ লম্পট প্রকৃতির কথা সৃষ্টির মুহূর্ত হইতেই অবগত আছে। একালের নারীবাদী কবিরা, প্রাবন্ধিকরা যাহা লিখিতেছেন তাহা শতকরা একশো ভাগ সত্য। পুরুষ শুণ্ডধারী জলশুক্তির ন্যায়, রোঁয়াধারী শুককীটের ন্যায়, গুল্ম বাহিয়া, পদদ্বয়ের মসৃণ ত্বক বাহিয়া কিলিবিলি করিতে করিতে, জঘনে আসিয়া যাবতীয় জঘন্যকার্য করিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে। দুর্গন্ধী রোমশ ঋক্ষের ন্যায় দেহকাণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া অন্ধ উল্লুকের ন্যায় নাভিদেশে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ঠোকরাইতে থাকে। উল্লুকের ন্যায় উকু উকু শব্দে কোমল বক্ষদেশ খাবলাইতে থাকে। কমঠের ন্যায় যত্রতত্র দংশন করিতে করিতে একসময় ক্লান্ত সারমেয়ের ন্যায় ল্যাতকাইয়া পড়ে। নগরপাল, ধর্মপাল, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপাল, ক্ষেত্রপাল সকলেরই এক অবস্থা। রমণীর রমণীয় শরীর দেখিবামাত্র—'দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা।' ডেমোস্থেনিস উত্তম বলিয়াছিলেন, আমারও বলিতে বাসনা হইতেছে,

Man has the desire for erotic enjoyment: concubines for daily use; and wives of his own rank to bring up children and to be faithful house wives...

পাঠদশায় আর যাহাই হউক, কনকুবাইনই বা কোথায়, ওয়াইফই বা

কোথায়। পাশ করিব, চাকরি করিব, তৎপরে পিতা-মাতা আমার জন্য বধূ ধরিয়া আনিবেন। চড়াই পাখির মতো সামান্য প্রেমই ভরসা। আমার ভবিতব্য স্ত্রীকে ঘিরিয়া যখন হলুদ বোলতারা উড়িতেছিল, তখন প্রশ্ন আসিয়াছিল, রমণীরা কি সত্যই প্রেমে পড়েন। একই সঙ্গে এতগুলি ছাগলকে যিনি অনায়াসে চরাইতে পারেন তিনি তো রাখাল। রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। উচ্চাঙ্গের একটি উপমা মনে আসিয়াছিল—যথা, নারী কি সরোবর? জলে মানুষ পড়ে। পড়িয়া সন্তরণবিদ্যা আয়ত্তে না থাকিলে, হাবুডুবু খাইয়া, পেট ফুলিয়া, লাংস ফাটিয়া মরিয়া যায়। জল কি কখনও মানুষে পড়ে। তখন শেক্সপিয়ার পড়িতেছিলাম, দেখিলাম ক্ষুব্ধ হ্যামলেট বলিতেছেন, 'Frailty, thy name is woman'। বিশ্বস্ত না থাকাটাই নারীর ধর্ম। ইহা অবশ্য নারীর কথা নহে, পুরুষের দর্শন।

একটি লোককাহিনি এই প্রসঙ্গে মনে আসিতেছে। অনেকটা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি অথবা শুক-শারির কাহিনির মতোই। হিন্দি ভাষায় প্রচলিত এই নামে—'কিসসা তোতা ময়না'। সারা দিবস ওড়া-উড়ি করিয়া ক্লান্ত শুক একটি বৃক্ষশাখায় আসিয়া রাত্রির বিশ্রামের জন্য বসিল। সেই বৃক্ষে একটি স্ত্রী ময়না বসবাস করিত ও সেই পক্ষীটি ছিল ঘোরতর নারীবাদী, যাহাকে একালে আমরা বলিতেছি, 'ফেমিনিস্ট'। ময়না গাল গলা ফুলাইয়া, পুরুষ শুককে বলিল, 'ওহে শুক, এখান থেকে কেটে পড়ো। মদ্দাদের আমি সহ্য করিতে পারি না। তারা অসভ্য, ইতর, চামার, নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসী। দেখলেই আমার পিত্তি চটে যায়, গা রি রি করে। তোমার সঙ্গে একই গাছে রাত কাটাতে আমার ঘেন্না করবে।'

শুক তখন পুরুষদের পক্ষে লড়াই করিবার জন্য বলিল, 'ময়নাসুন্দরী, মেয়েরাও কিছু কম যায় না, তাহলে শোনো বলি, কাঞ্চনপুরায় অঙ্গধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানির নাম ছিল চন্দ্রপ্রভা। রানি খুব ধার্মিক আর পতিপরায়ণা ছিলেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এসে রাজা অঙ্গধ্বজকে দু'টুকরো কাগজ দিয়ে চলে গেলেন। একটাতে লেখা রয়েছে— যে রাজা সারা রাত জেগে থাকতে পারে, সে খুব ভাল ফল পায়। দ্বিতীয় টুকরোয় লেখা আছে—যে শত্রুকে সম্মান জানাতে পারে তার সমস্ত অপরাধ খণ্ডন হয়ে যায়। দিন যায়, হঠাৎ রাজার মনে হল, দেখাই যাক ব্রাহ্মণের নির্দেশ পালন করলে কী হয়। ঠিক করলেন, সারা রাত জাগবেন সেদিন। রাজপ্রাসাদে জেগে বসে আছেন রাজা। গভীর রাতে। হঠাৎ কানে এল, প্রাসাদের বাইরে কোনও মহিলা কাঁদছেন। কাঁদছে কেন! তার মানে, আমার রাজত্বে দুঃখী মহিলা আছে। আমি

মানুষের দুঃখ দূর করতে পারিনি। আমি ব্যর্থ। রাজা ছুটলেন। কান্নার শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখলেন, এক বৃদ্ধা কাঁদছেন। রাজা দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন। বৃদ্ধা বললেন, 'পৃথিক, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও, ভগবনেরও ক্ষমতা নেই আমার দুঃখ দূর করেন।' শেষে রাজার ঝোলাঝুলিতে বৃদ্ধা বললেন, 'একটি শর্তে তোমাকে বলতে পারি, তুমি যা শুনবে কারও কাছে বলবে না। যদি বলো, তাহলে তুমি পাথর হয়ে যাবে।' রাজা বললেন, 'ঠিক আছে মা, তুমি বলো, আমি কারোকে বলব না।' বৃদ্ধা তখন বললেন, 'পুত্র! আগামীকাল রাত দশটার সময়, রাজা অঙ্গধ্বজকে সাপে কামড়াবে। রাজা মারা যাবেন। এমন ধার্মিক রাজা আর আমরা কোথায় পাব। তাই আমি কাঁদছি পুত্র!' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, সাপটা আসবে কোথা থেকে?' বৃদ্ধা বললেন, এই নগরের পশ্চিম দিকের সিংহদুয়ারের বাইরে যে শিবমন্দির আছে, তার পাশেই আছে একটা বটগাছ। সেই বটের কোটরে সাপটা থাকে। সাপটার সঙ্গে রাজার পূর্বজন্মের শত্রুতা। এইবার সে বদলা নেবে!' রাজা প্রশ্ন করলেন, 'মা, সাপের সঙ্গে রাজার কীসের শত্রুতা?' বৃদ্ধা তখন রাজার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বললেন। 'পুত্র! আমাদের রাজা পূর্বজন্মে এক বণিক ছিলেন, নাম ছিল মণিসেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল কেশর। কেশরের বয়স তখন কুড়ি, আর পরমা সুন্দরী। মণিসেন একদিন বাণিজ্যে গেলেন। স্ত্রীকে রেখে গেলেন আঠেরো বছর বয়সের এক ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে। মণিসেন বাণিজ্যে। বাড়িতে কেশর আর গৃহভৃত্য। হঠাৎ কেশরের একদিন ভীষণ দেহবাসনা জাগল। কিছুতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। শেষে শোবার ঘরে ভৃত্যকে ডেকে বললে, বিছানায় বোস। আমার পাশে বোস। তারপর পরিষ্কার বললে, আমি তোকে চাই। এক্ষুনি চাই। ভৃত্য প্রস্তাব শুনে কেঁদে ফেলেছে, হাতজোড় করে বলছে, আমি পারব না, আপনি আমার মা। আমি বড়দের কাছে শুনেছি, যিনি অন্নদাতা, তিনিই পিতা অথবা মাতা। প্রভু পত্নীর সঙ্গে গর্হিত কাজের পরিণাম, নরকবাস। কেশর তো তখন ভীষণ কামার্ত। ভৃত্যকে বলছে, যা বলছি, তা যদি না করিস, তাহলে ফল কিন্তু খুব খারাপ হবে। ছেলেটিকে খুব ভয় দেখাল। সে কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না। কিছুদিনের মধ্যে বণিক মণিসেন ফিরে এলেন। কেশরের খুব চিন্তা হল, ছেলেটা যদি স্বামীকে সব কথা বলে দেয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে ছেলেটার মুখ বন্ধ হয়, আর তাকে প্রত্যাখ্যানের জন্যে যেভাবে অপমানিত হয়েছে তার উচিত সাজা পায়। ছেলেটা কেশরকে অপমান করেছে।'

মণিসেন বিষণ্ণ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিয়ে। তোমার কী হয়েছে, ফিরে এসে দেখছি, সদাই বিষণ্ণ, কীসের দুঃখ তোমার, আমাকে বলো। কেশর বললে, প্রভু! তোমার বাড়ি-ঘর তুমি বুঝে নাও, আমি আত্মহত্যা করব।' মণিসেন বললেন—'সে কী! কী হয়েছে! তুমি আমাকে খুলে বলো।' কেশর একেবারে উল্টো কথাটি বললে, "আপনি যখন ছিলেন না, তখন একদিন রাতে, ছাদে বিছানা পেতে শুয়ে আছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখি আপনার চাকর আমার বুকে চেপে বসে আছে। আর বেশিদূর এগোবার আগেই আমার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এল। আমি লজ্জায় তাদের আর কিছু বলিনি। বলেছিলুম, ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছি।' মণিসেন সেই রাতেই ভৃত্যকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দিলেন। এই জন্মে সেই মণিসেনই অঙ্গধ্বজ, আর সেই গৃহভৃত্যই সাপ হয়ে জন্মেছে।

বৃদ্ধার কথা শুনে রাজা অঙ্গধ্বজ প্রাসাদে ফিরে এলেন। শুক বললে, 'তাহলে দেখো ময়না, মেয়েরা কী সাংঘাতিক। নিরপরাধ, প্রকৃত ধার্মিক একটি ছেলের মৃত্যুর কারণ হল।' ময়না বললে, 'মানতে পারলুম না। তোমার এই কাহিনিতে নারী ও পুরুষ দু'জনেই সমান অপরাধী। মণিসেন স্ত্রৈণ ছিল। সুন্দরী স্ত্রীর ভেড়ুয়া। তার উচিত ছিল স্ত্রীর কথা যাচাই করা।' শুক বললে, 'তোমার এই কথায় আমার কথাই জোরদার হচ্ছে। মেয়েরা কত ভয়ঙ্কর বোঝো একবার। কীভাবে মোহজাল বিস্তার করে। পুরুষকে কীভাবে বশ করে ফেলে। বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়। গলা জড়িয়ে ধরে, মিষ্টি কথা বলে, দেহের ফাঁদে ধরে যে-কোনও কাজই করাতে পারে।'

ময়না বললে, 'এরও জবাব আছে।' শুক বললে, 'দাঁড়াও, আমার গল্প এখনও শেষ হয়নি।' রাজা প্রাসাদে ফিরে এসে ভাবছেন, কী করা যায়। মরতে যখন হবে তখন মরতেই হবে। তবু দেখা যাক ব্রাহ্মণের দেওয়া দ্বিতীয় কাগজের নির্দেশ পালন করে কী হয়। শত্রুকে সম্মান জানাতে বলেছেন। সাপই এখন পরম শত্রু। সকালে প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। রাজা বললেন, 'আজ রাত দশটার সময় একটা সাপ আসবে আমাকে কামড়াতে। শিবমন্দিরের পাশের বটগাছের কোটরে সাপটা থাকে। সেই গর্ত থেকে আমার বিছানা পর্যন্ত গোটা পথটা আপনি আপনার কর্মচারীদের দিয়ে পরিষ্কার করান। আতর ছড়িয়ে, গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ঢেকে দিন, আর পথের দু'পাশে সারি সারি সুন্দর বাটিতে সুগন্ধী দুধ রাখুন।' রাত দশটার কিছু আগে সাপ বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। ভীষণ তার রাগ। পূর্বজন্মের হত্যাকারীর আজ শেষ দিন। কিন্তু

সাপ তো অবাক। এ কী ব্যাপার। যেদিকেই তাকাচ্ছে, গোলাপ আর গোলাপ, সুগন্ধ। সার সার বাটিতে সুগন্ধী দুধ। শত্রুকে কি এইভাবেই সম্মান জানাতে হয়।

রাজবাড়ির ঘড়িতে ঠিক রাত দশটা। সাপ এসে ঢুকল রাজার শয়নকক্ষে। বিছানায় প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন রাজা। সাপকে দেখে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি, আসুন দংশন করুন।

সাপ সমস্ত শত্রুতা ভুলে রাজাকে বললে, 'মহারাজ। সব শত্রুতা আমি ভুলে গেছি। এমন উদার, অপূর্ব ধার্মিক রাজা পৃথিবীতে সম্ভব? ধন্য আপনার পিতামাতা। আপনি সুখে রাজত্ব করুন। সাপ তুষ্ট হয়ে রাজাকে ক্ষমা করে চলে গেল।

রানি তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'মহারাজ! আপনি আগেই কীভাবে জানলেন সাপ আপনাকে কামড়াতে আসবে।' রাজা বললেন, রানি সেই কথাটা তুমি জানতে চেয়ো না। আমি যদি তোমাকে বলি, তাহলে আমি পাথর হয়ে যাব।' রানি কিন্তু নাছোড়বান্দা। ভীষণ তাঁর কৌতূহল। রাজাকে বললেন, 'সে আপনি পাথরই হোন আর যাই হোন, আপনাকে বলতেই হবে, তা না হলে, আমি আত্মহত্যা করব।'

রাজা বললেন, 'বেশ, তাই যখন তোমার ইচ্ছে, তখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকো। পাথর আমাকে হতেই হবে। কাল সকালে গঙ্গার ধারে পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমাকে বলব। সেইখানেই আমি পাথর হয়ে থাকব।'

রানিকে সবাই খুব বোঝালে, রাজা যদি পাথর হয়ে যান, তাহলে শুনে আপনার লাভটা কী হবে। সত্যিই তো! রানি বলে আপনাকে কে আর তখন সম্মান করবে! রাজাকেও বোঝানো হল। তিনিও বুঝতে চাইলেন না। রানির প্রেমে অন্ধ। রানিকে ছেড়ে তিনি এক মুহূর্তও থাকতে পারবেন না। তার আত্মহত্যার চেয়ে নিজের পাথর হয়ে যাওয়া ভাল। রানিকে তিনি বলতেই পারলেন না, কেন তুমি এমন অবুঝ হচ্ছ। আসক্তি এমনই জিনিস, বুঝেছ ময়না।

সকালবেলা গঙ্গার ধারে দৃশ্য প্রস্তুত। রাজ্যসুদ্ধ লোক সেখানে এসে গেছে। তাদের প্রিয় রাজার কী হয় দেখার জন্যে। পাথর হয়ে যাওয়া মানেই রাজার মরে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী এখনও রানিকে বোঝালেন, পাথর হয়ে গেলে এমন সুন্দর রাজা কি আর দুটো পাওয়া যাবে। এঁর তো কোনও দ্বিতীয় হবে না। এরপরে যিনি রাজা হবেন, তিনি তো সিংহাসনে বসেই আপনাকে দূর করে

দেবেন। জেদি, একগুঁয়ে মেয়েদের জীবনে কিন্তু অনেক দুঃখ লেখা থাকে।

রানি বললেন, 'তেমন কোনো উদাহরণ আমার জানা নেই মহামন্ত্রী।'

মন্ত্রী বললেন, তাহলে শুনুন, 'সুরসেন নামে এক নগরের রাজার নাম ছিল রূপদত্ত।

তিনি নিজে যেমন সুন্দর ছিলেন, তাঁর স্ত্রী চন্দ্রকান্তাও ছিলেন ভীষণ সুন্দরী। সুন্দরী হলে কী হবে। মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। বিয়ের আগে থেকেই তার একজন প্রেমিক ছিল। চন্দ্রকান্তা সেই প্রেমিককে হিজড়ে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এল। রাজা রূপদত্তের কোনও সন্দেহ হল না। রানির সেবার জন্যে একজন হিজড়ে আসতেই পারে। কিন্তু তা তো নয়। রাজা রাজকার্যে বাইরে গেলেই চন্দ্রকান্তা তার প্রেমিকের সঙ্গে রপ্টারপ্টি কাণ্ড করে। দু'নম্বরি তো বেশিদিন চাপা থাকে না। রূপদত্ত একদিন জড়াজড়ি অবস্থায় দু'জনকে ধরে ফেললেন। বউকে বললেন, একে তুমি ছাড়তে পারবে? বউ বললে, অসম্ভব, ওকে আমি আমার হৃদয় দিয়েছি। রূপদত্ত বললেন, বহুত আচ্ছা! তুমি তাহলে আমাকে তোমার নাক আর কান দুটো দিয়ে বনে চলে যাও। নাক, কান কাটা চন্দ্রকান্তা গেল বনে, আর তার সোহাগের প্রেমিককে চড়ানো হল শূলে।'

প্রধানমন্ত্রী কাহিনি শেষ করে বললেন, 'তা হলে একবার ভেবে দেখুন, শাস্ত্র বলেছেন, রাজা আর যোগী, আগুন আর জল বিপরীতধর্মী, যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভাল। কারণ তাদের পিরিত খুব অনিশ্চিত।'

মন্ত্রীর কথায় কোনও পাত্তাই দিলেন না রানি। যা হয় হবে, আমি জানবই। রানির প্রেমে রাজা অন্ধ। শেষ মুহূর্তে অনেকেই অনেক রকম বোঝালে। মন্ত্রীরা বলতে লাগলেন, 'মহারাজ। আপনি এমন বিচক্ষণ, প্রজাদরদি, জ্ঞানী, ধার্মিক, আপনি একটি মেয়ের কথায় নাচছেন। এই রানি আত্মহত্যা করলে, এর চেয়ে ভাল আরও দশটা আপনাকে এনে দেব। আপনি বিবেচকের মতো কাজ করুন।' রাজা রানির মোহে বুঁদ। পরিষ্কার বললেন, 'ওকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব।' সবাই তখন হাল ছেড়ে দিলেন। যা হতে চলেছে তাই হোক।

রাজা গেলেন গঙ্গার স্নানে। স্নান সেরে পবিত্র হয়ে চিরকালের মতো পাথর হয়ে যাবেন। শেষবারের মতো গঙ্গাদর্শন করবেন প্রাণ ভরে। তাই বসলেন তীরে। এমন সময় কোথা থেকে একপাল ছাগল এল জল খেতে। সব ছাগলই জল খেয়ে চলে যাচ্ছে, কেবল একটা ছাগলি জলের কিনারায় দাঁড়িয়েই আছে, দাঁড়িয়েই আছে। তখন দলের কর্তা ছাগলটা এসে জিজ্ঞেস

করলে, তোর আবার কী হল! ছাগলিটি স্রোতে একটা ফল ভেসে যাচ্ছে দেখছে। সে বললে, ওই ফলটা আমাকে না এনে দিলে যাব না। ছাগল কর্তা বলছে, এনে তো দেব, কিন্তু আমি যদি ডুবে যাই। ছাগলির বায়না, তোমার যাই হোক, ফলটা না এনে দিলে আমি নড়ব না। কর্তা ছাগল তখন খেপে আগুন। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। কর্তা ছাগল বলছে, শোন্, আমাকে তুই রাজা অঙ্গধ্বজের মতো বোকা পাঁঠা ভাবিসনি, যে বউয়ের কথায় নাচতে নাচতে চলে এল গঙ্গার ধারে জীবন দিতে। তুই তাহলে এখনও আমাকে ঠিকমতো চিনতে পারিসনি। ওই সব ছেনালি রাখ। চল্। দামড়া ছাগল্ ছাগলিটাকে গুঁতোতে গুঁতোতে দলের দিকে নিয়ে চলল। রাজামশাই কান খাড়া করে কথাটা শুনলেন। ভয়ঙ্কর একটা ধিক্কার এল রাজার মনে। আমি একটা ছাগলেরও অধম। নারীর প্রতি প্রবল আসক্তির ফলে আজ আমার এই অবস্থা। যে রানিকে আমি এত ভালবাসি, সে আমার প্রাণ নিতে চাইছে, আর আমি বোকার মতো আমার মূল্যবান জীবন নষ্ট করতে চলেছি। আমি ছাগলেরও ছাগল।

রাজা স্নান সেরে ফিরে মন্ত্রীমণ্ডলী ও রানিকে ডেকে বললেন, 'কথাটা হল এই, আমি সেই গোপন কথাটি বলে পাথর হয়ে যাব, মানে মরে যাব, তা রানি তুমি কী তাই চাও।' রানি বললেন, 'মহারাজ! আপনার যাই হোক আমি রহস্যটা জানতে চাই।'

রাজামশাই তো আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ছাগলের কথায় তাঁর বোধোদয় হয়েছে। তাঁর মনে পড়ে গেছে, কবির কথা, সন্তানের জন্ম দিয়ে নারী মা হয়, বালিকা অবস্থায় সহবাস, কখনও সে দেবী, পূজিতা, আবার কখনও সেই নারীই স্বয়ং মৃত্যু, জীবন ছিনিয়ে নেয়। রাজা কিছু আগেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, এত নির্বোধ আমি। শত ধিক্কার সেই পুরুষকেও যে সব খুইয়ে দুষ্ট নারীর মিষ্টি কথায় দাসে পরিণত হয়।

রাজা বললেন, 'রানি এইবার তাহলে দেখ আমি কী করি।' একটা চাবুক চেয়ে নিয়ে প্রিয় রানিকে বেধড়ক পেটাতে লাগলেন। রানি পায়ে ধরে তখন ক্ষমা চাইছেন। রাজার তখন পৌরুষ জেগেছে। কোটালকে ডেকে বললেন, 'একে নিয়ে যাও, চোখ দুটো তুলে নিয়ে বনে ছেড়ে দিয়ে এসো।'

শুক বললে, ময়নাসুন্দরী আমার যা বলার তা বলা হয়ে গেল। মোদ্দা কথা হল, নারী জাতিকে বিশ্বাস করা কখনই উচিত নয়, করেছ কী মরেছ।

এই গল্পটি বলিবার উদ্দেশ্য, নারীরা পুরুষকে বাদ দিবার জন্য ঘোরতর

আন্দোলনে নামিয়াছেন, ম্যাগি-রন্ধনে নিযুক্ত আমার অধ্যাপিকা স্ত্রীও সেই আন্দোলনে সামিল হইয়াছেন। কাগজের মণ্ড হইতে প্রস্তুত বীভৎস একটি রাক্ষসের মুখোশ আনিয়া বসিবার ঘরের দেয়ালে ঝুলাইয়া বুঝাইতে চাহিতেছেন, উহা আমারই ভিতরের মুখ। পুরুষকে তাঁহারা কী বাদ দিবেন, বহু পূর্ব হইতেই পুরুষ তাহার জীবন হইতে নারীকে বাদ দিবার জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টা চালাইতেছে। পারিতেছে না, কারণ যখন শহরে ষণ্ডদের অবাধ বিচরণের সুযোগ ছিল তখন দেখিয়াছি, বাঁধাকপির পাতা চিবাইতে চিবাইতে বিশাল ষণ্ড ধিতিং ধিতিং করিয়া গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। লাজলজ্জা নাই। স্মরণে নাই, কোন দেবতার বাহন।

তাহা হইলে সমর সেন মহাশয়ের 'বাবু বৃত্তান্ত' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে হয় পুরুষদের মানসিকতা স্পষ্ট করিবার জন্য : 'উত্তরদিকে অসচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি মেয়েকে দেখার জন্যে সন্ধ্যেবেলায় আমাদের চারতলার নেড়া ছাদে ভিড় হত। মেয়েটির নাম ইতি, পাকা সোনার মতো রং, দেহের গড়ন দেখার মতো, বিশেষ করে সাঁঝের বেলায় গা ধোওয়ার পর যখন শাড়ি মেলে দিতে আসত। দাদার বন্ধু বড়লোক ব্রাহ্মণ যুবক বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু কৌলীন্যের দাপটে কন্যাপক্ষ রাজি হননি। পশ্চিমদিকের বাড়িতে তেতলা ঘরে রাত্রে নীল আবছা আলোয় একজন অ্যাটর্নি তার নধর স্ত্রীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রীয় রতিরঙ্গে মত্ত হতেন, বড়রা বলত 'rolling stone gathers no moss।'

বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। নারীর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। পজেটিভ ও নেগেটিভের ব্যাপার। প্লাস ঘুরিতেছে মাইনাসের জন্য। প্লাস ষণ্ড, মাইনাস প্রকৃতি। যতক্ষণ না মাইনাস জুটাইতে পারিতেছ ততক্ষণ নানা অনাসৃষ্টি করিয়া বেড়াইবে। ছাতে উঠিয়া রমণীর স্নানদৃশ্য দেখিবে, বাসে চড়িয়া ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিবে। বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রীর সঙ্গী হইয়া বিবাহবাসরে নেগেটিভ দেখিয়া আবোলতাবোল বকিবে। শেক্সপিয়ার যথার্থই লিখিয়াছেন—She's beautiful and therefore to be woed/she is a woman, therefore to be won.

আমি আমার স্ত্রীকে জয় করিবার জন্য যাহা করিয়াছিলাম তাহা ভাবিলে এই প্রবীণ বয়সে কামরাঙা হইয়া যাই। ময়দানের বিশাল বৃক্ষমূলে বসিয়া সোহাগের কথা বলিতাম। কবিতা আবৃত্তি করিতাম। ঘষড়াইয়া ঘষড়াইয়া তাহার সহিত ঘোঁতঘোঁতে অবস্থায় আসিবার চেষ্টা করিতাম। বটপাতার আঠার

মতো জড়াইবার চেষ্টা করিতাম। পুলকে আমার শরীর শিহরিত হইত। আবেগে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইত। ভাবিতাম Love is an activity, not a passive affect; it is 'standing in', not a 'falling for'। রাসেল হইতে উদ্ধৃত করিতাম, I regard love as one of the most important things in human life, and I regard any system as bad which interferes unnecessarily with its free development. বলিয়াই তাহার হাত খামচাইবার চেষ্টা করিতাম, আর সে সঙ্গে সঙ্গে বলিত, 'ছিঃ ছিঃ কমিট নো নুইসেনস ইন দি পাবলিক প্লেস।' তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল ওই নারীর মধ্যে নারী-বাদ সুপ্ত আছে। কালে উগ্ররূপ ধারণ করিবে। তথাপি শেক্সপিয়ার যাহা বলিয়াছেন, 'Love looks not with the eyes, but with the mind/ and therefore is winged cupid painted blind.' মন ওই রমণীতে এমনই মগ্ন হইল যেন কালীদহের পাঁকে হাতি পড়িয়াছে। বৃক্ষমূলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া বলিতাম, 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' প্রত্যুত্তরে রমণী কিছুই বলিত না। দন্তাগ্রে দূর্বাদি তৃণখণ্ড কুটুস কুটুস করিয়া কাটিত ও থুকুস থুকুস করিয়া ছিটাইত। কখনও বলে নাই, ইয়েস, আই অলসো লাভ ইউ। আমার সুহৃদরা আমাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিল, রমণীরা মুখে প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করিতে লজ্জা পায়। লাভ ও টয়লেট, দুটি শব্দই তাহাদের কাছে সমর্থক। তাহাদের ভিতরে প্রেম থাকে, যেমন কচুরির মধ্যে ডালের পুর থাকে। বাহির হইতে ফসকা লুচি মনে হইলেও রমণীরা আসলে কচুরি জাতীয় প্রাণী। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সেবা, আনুগত্য, সহমর্মিতার পুঁটলি। যথা নিয়মে ব্যবহার করিতে পারিলে অপার শান্তি। উল্টাদিকে ঘর্ষণ করিলেই অনর্থ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন, 'একটি পবিত্র নূতন জীবকে জগতে আনিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মিলন—সুতরাং ভগবানের নিকট উহা তাহাদের এক সর্বোচ্চ মিলিত প্রার্থনা।' এ কি কৌতুক? এ কি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, না পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা? হিন্দু বলে, 'না, না, কখনই না।'

স্ত্রী হিসেবে তাহাকে অর্জন করিয়া সংসারে প্রবেশের মুহূর্তে স্বামীজিকে আর একবার পাঠ করিলাম চেতবাণী হিসেবে, 'ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর জাতি জাতি করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। ... মনু মহারাজ বলিয়াছেন

যে, যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ— যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা (পাশ্চাত্যের লোকেরা) তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র। আমাদের দেশে সকলে অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।'

দেখিয়াছি, প্রেমিক এক জীব আর স্বামী আর এক জীব। স্বামী শব্দটিই 'ভালগার'। তাহার মধ্যে লুঙ্গি ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরা লোমঅলা একটি দানব বসিয়া দাঁত খুঁটিতেছে ও মাংস জাতীয় ভুক্তাবশেষের 'ফাইবার' বাহির করিতেছে। সচেতন আমি চিরপ্রেমিক থাকিবার চেষ্টা করিলাম। সংসারটিকে ময়দানের সেই বৃহৎ বৃক্ষ ভাবিলাম। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া আছি তাহার মূলে। সুমিষ্ট স্বরে, কবিতার ভাষায় কথা বলিতেছি। দিবা আটটা পর্যন্ত বিছানায় গোঁত্তা মারিয়া পড়িয়া থাকিয়া নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে বলিতেছি না—'হ্যাঁ গা চা কি হল!' কখনই বলিতেছি না, ব্যঞ্জন নুনে যবক্ষার, কী ঝালে পোড়া। সমমর্যাদা বিশিষ্ট দুই প্রাণী। একই পক্ষীর দুইটি ডানা, পুরুষ ও প্রকৃতি। অনুমতি ভিন্ন কোনও কাজই করি না। হায়! উল্টা বুঝিলি রাম। আমার স্ত্রীই আমাকে একদিন মধ্যরাত্রে অতিশয় তিরস্কার করিলেন, 'তোমার আদিখ্যেতা আর ন্যাকামিটা কমিয়ে একটু পুরুষ হওয়ার চেষ্টা করো না। পায়ে পায়ে ল্যাজ খাড়া করে বেড়ালের মতো ঘুরো না। মা বলছিলেন, ছেলেটাকে আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছে, উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। মেনিমুখো পুরুষ মেয়েদের অসহ্য লাগে।'

তৎক্ষণাৎ আমার বিল্বমঙ্গলের কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রেমিক এইভাবেই প্রেমিকার দ্বারা তিরস্কৃত হয়। যাহার জন্য চুরি করা হয়, সেই বলে চোর। আমি ইচ্ছা করিলেই হাঁড়িমুখো হুলো হইতে পারিতাম। কিন্তু প্রথম রাত্রেই বিড়াল কাটিবার পরামর্শ উপেক্ষা করিবার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল। সংসার বলিতে লাগিল স্ত্রৈণ, স্ত্রী বলিতে লাগিল, পার্সোন্যালিটি নাই। ইদানীং নারীবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। জ্বালাময়ী প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া তিনিই এখন স্বামী, আমিই এখন সগুম্ফ স্ত্রী। ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়াছিলাম, সেই শৃগালটির মতোই— 'আমি তো তোমার জল ঘোলা করিনি।' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুমি করো নাই সত্য, কিন্তু তোমার বাপ তো করিয়াছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে তাহলে বিবাহ করিলে কেন। ঝাঁক হইতে

প্রেমের বঁড়শিতে গাঁথিয়া এই মাছ অথবা মালটিকে তুলিলে কেন? জবাব শুনিয়া গলদেশে রজ্জু পরাইবার বাসনা হইল। এমত উত্তর শুনিবার চেয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগই শ্রেয় ছিল। তিনি স্পষ্টই কহিলেন, 'মেয়েরা মর্কট পুষিতে ভালবাসে।'

সম্প্রতি এমন সব কথা বলিতেছেন, যাহার প্রতিবাদে আমার কিছু বলার নাই। সেদিন প্রশ্ন করলেন, 'নারী কাহাদের চক্রান্তে এই দেশে বারো হাত শাড়ি পরিয়া, তলায় শায়া পরিয়া জড়ভরত হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা পুরুষেরই আদিম চক্রান্ত। দ্রৌপদী যদি জিনস পরিয়া কৌরবসভায় প্রবেশ করিত, তাহা হইলে দুর্যোধন, দুঃশাসনের বাপের ক্ষমতা থাকিত বস্ত্রহরণ করিবার! বুদ্ধিমতী পশ্চিমি রমণীরা সেই কারণে কেহ হরণ করিবার পূর্বে নিজেরাই পোশাক হরণ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্ষুধার্ত পুরুষ সমাজকে তাল ঠুকিয়া বলিতেছে, দ্যাখ ব্যাটারা দ্যাখ, শরীর কত দেখবি দ্যাখ। দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া, তাহারা আর দেখিয়াও দেখে না। সমর সেন কথিত সেই ব্রাহ্মণ যুবতীটিকে চক্ষু দ্বারা লেহন করিবার জন্য তাহারা 'চারতলার ন্যাড়া ছাতে' গুঁতাগুঁতি করে না। শয়নকক্ষে নীল আলোতে অ্যাটর্নি চন্দ্রের ভারতচন্দ্রীয় প্রেম দেখে না। সমুদ্রসৈকতে সারি সারি বিবসনা শায়িতা, যেন 'হলোকস্টে' মৃতা নগরীর হৃত সুন্দরী। পাশ্চাত্যের কোথাও স্যাকরার ঠুকঠাক নাই, কামারের এক ঘা। তাহারা মিনমিনে প্রেমিকার ছদ্মবেশে সূচ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল হইয়া বাহির হয় না। তাহাদের পৌরুষ অন্য ধরনের। যাহা নাই, অথবা ছিল কোনও কালে, মরিয়া ভূত হইয়াছে, সেই প্রেম নামক ন্যাকামিটি জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এদেশের রমণীরাও জানে প্রেম নাই, ছিল না কোনওদিন। আছে প্রয়োজন। কচি কচি মেয়েরা প্রথমে প্রেমে পতিত হয় তাহার পর অধিকাংশই পতিতা হইয়া যায়। হইয়া বুঝিতে পারে To us, all customers are pretty much alike. Always the same categories. পাশ্চাত্যের পুরুষরা 'ধর তক্তা মার পেরেক' মন্ত্রে বিশ্বাসী। মুক্তিপ্রাপ্তা নারী বলিতেছেন, আমার প্রয়োজন হইলে তু তু করিয়া ডাকিব, প্রয়োজন ফুরাইবা মাত্র লাথ মারিয়া বিদায় করিব। কয়েক ঘন্টার প্রয়োজনের নিমিত্ত গাঁটছড়া বাঁধিয়া দামড়াটির সহিত দরমার খাঁচায় প্রবেশ করিব ও হুঁকোমুখো শ্বশুর, থ্যাবড়া নাকি শাশুড়ি, খোন্তাদাঁতি ননদিনী, দল পাকাইয়া নিপীড়নযন্ত্র চালু করিবে, তাহা হইতে দিব না। এতকাল ফাঁদ দেখাইয়াছ, এইবার আমরা ঘুঘু দেখাইব। পাশ্চাত্যের মানসিকতা আমদানি করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি—

ক্ষুধা পাইলে মানুষ আহার করিবে, ধূমপান করিবার ইচ্ছা হইলে ধূম্রপান করিবে, গান গাহিবার ইচ্ছা হইলে আ আ করিবে, পড়িবার ইচ্ছা হইলে বই খুলিবে, করিবার ইচ্ছা হইলে করিবে। তাহার জন্য স্ত্রী নামক ব্যবহারযোগ্য সম্পত্তিটিকে চিরস্থায়ী, মোকরুরি ব্যবস্থায় আনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যখন আমরা সন্তান ধারণ আর পরিবার পালনের শিক্ষা ছাড়া আর কোনওরূপ শিক্ষা পাইতাম না, তখন পতি পরম গুরু জ্ঞানে হেঁচকি তুলিতাম। এখন গ-এর তলা হইতে উ-টি উৎপাটিত করিয়াছি। এলিস সাহেব আমাদের পুরুষের স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন :

'Even men who are happily married to women in all chief respects fitted to them, are apt to feel, after some years of married life, a mysterious craving for variety.'

তোমরা আমাদের এতকাল খাইয়াছ, এইবার আমরাও তোমাদের খাইব। কৃষ্ণের অপরাধের বদলা লইব। শ্রীরাধিকার প্রেম লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন। যমুনা পুলিনে কড়কড়ডুমা করিয়াছেন। রাসলীলার নাম করিয়া, কুঞ্জকাননের দুয়ার রুদ্ধ করিয়া 'অরগিয়্যাস্টিক সেক্সের' প্রচলন করিয়াছিলেন সেই দ্বাপরেই। তাঁহার জীবনকাহিনি যেহেতু পুরুষের হাতের নির্মাণ সেই হেতু তিনি অবতার। তিনি সখা অর্জুনকে 'ইলোপ' করিতে শিখাইয়াছিলেন।

উত্তম প্রস্তাব। দুই রিপাবলিকে পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাউক। মধ্যে বার্লিন ওয়াল। এপার্শ্বে নারী সাম্রাজ্য, ওই পার্শ্বে পুরুষ সাম্রাজ্য। জনসংখ্যা যাহা আছে, তাহাই রহিল। পুরুষদের দিকের জনসংখ্যা ক্রমেই কমিবে। অসুখে মরিবে, যুদ্ধে মরিবে, বয়সে মরিবে। বাড়াইবার উপায় তো প্রাচীরের ওই পার্শ্বে, নারী সাম্রাজ্যে। উপায় কী হইবে! নারীর সংখ্যাও তো কমিতে থাকিবে। তখন চুক্তি হইবে। একালের 'গ্যাট' চুক্তির ন্যায়। 'ডাংকেল' প্রস্তাব যাইবে। পুরুষ রিপাবলিকেই তো থাকিবে 'স্পার্ম ব্যাঙ্ক'। প্রাচীর টপকাইয়া ওই পার্শ্বে যাইবে 'স্পার্ম'। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, সন্তান পুরুষ হইলে পুরুষদের দিকে চালিয়া আসিবে। এখন প্রশ্ন হইল পশুদের কী হইবে? গাভিসকল ওইদিকে চলিয়া গেলে ষণ্ডসকল এইদিকেই থাকিবে। উভয় রিপাবলিকের তত্ত্বধানে সীমানা বরাবর এই পার্শ্ব ও ওই পার্শ্ব মিলিয়া একটি মুক্তাঞ্চল তৈয়ার হইবে। সেই স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী গাভিদের সহিত ষণ্ডের, ঘোটকের সহিত ঘোটকীর, সরমার সহিত সারমেয়র মিলন হইবে। হটকারী হইলে চলিবে না। সৃষ্টিকে তো রক্ষা করিতে হইবে।

আর একটি বিষয়ও ভাবিতে হইবে। পূর্বে দেখিয়াছি স্বাস্থ্যের কারণে যাঁহারা অহিফেন সেবন করিতে বাধ্য হইতেন, তাঁহাদের জন্য আবগারি বিভাগ 'ওপিয়াম পারমিট' দিতেন। প্রয়োজনে চিকিৎসকগণ ব্যবস্থাপত্রে 'ডাইনাম গ্যালেসিয়া' লিখিয়া দিতেন। সেইরূপ, যদি এমন হয় নারী রিপাবলিকে কোনও নারী পুরুষের সহিত সহবাসে বঞ্চিত হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আঁচড়াইতেছেন, কামড়াইতেছেন, কোনওভাবেই শান্ত করা যাইতেছে না এবং ওই মানসিক ব্যাধি ক্রমশই মহামারীর আকার ধারণ করিতেছে, যেমন প্লেগের সময় হইয়াছিল, তখন রেডক্রসের অনুকরণে স্থাপিত একটি সংস্থা পুরুষ রিপাবলিক হইতে স্বেচ্ছাসেবক লইয়া যাইবে। যুদ্ধের সময় তো উল্টাটাই হয়। ফ্রন্টে যোদ্ধাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখিবার জন্য সেক্সওয়ার্কার পাঠানো হইয়া থাকে। জৈবক্ষুধা তো প্রকৃতিরই দান। সে কী করিবে বাবা! রেমার্কের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, আহত সৈনিককে হাসপাতালে দেখিতে আসিয়াছে তাহার স্ত্রী। দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলনের সৌভাগ্য। সৈন্য তাহার আঘাত, যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সেই রমণীকে সাপটাইয়া ধরিয়াছে। সেবিকা তাহাদের উপর একটি চাদর ফেলিয়া দিয়াছেন। চাদর উঠিতেছে, চাদর পড়িতেছে।

এলিয়ট সাহেব তাঁহার বিষণ্ণতায় লিখিয়াছেন, 'মানবজীবনের আর কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। একটিই অর্থ দেখিতেছি, birth, copulation and death.' তৎপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রও একই কথা বলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মানুষের কর্তব্য কী? বঙ্কিম সহাস্যে বলিয়াছিলেন, 'অজ্ঞে, তা যদি বলেন তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন— 'এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া!'

নারী ও পুরুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘৃত ও অগ্নির সহিত তুলনা করিয়াছেন। একত্রে থাকিলেই বিপর্যয়! কলিন উইলসন সাহেব একই কথা অন্যভাবে বলিলেন, 'Sexual desire, in its simplest form, is a demand of the sexual organ, associated with it in exactly the same way that magnetism is associated with a magnet.' অর্থাৎ চুম্বকের চুম্বকত্বের মতোই। ইন্দ্রিয়কে উৎপাটিত করা অসম্ভব। অতএব, রাষ্ট্রপুঞ্জের ন্যায় একটি সংস্থা রাখিতেই হইবে, তাহা না হইলে প্রাচীরের উভয়পার্শ্বে উন্মাদ আর উন্মাদিনীদের নৃত্য শুরু হইবে।

নারীশূন্য জীবনে পুরুষদের খুব একটা অসুবিধা হইবার কথা নয়। ম্যাগি আমিও প্রস্তুত করিতে পারি। প্রাচীনরা পরলোকে চলিয়া যাইবার পর সপ্ত

ব্যঞ্জনের বিলাসিতা ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রাতের প্রথম কাপ চা নিজেই প্রস্তুত করি। ফিল্টার হইতে জল গড়াইয়া খাই। প্রেসারকুকারে এক আঙুল পরিমাণ জল দিয়া ঝরঝরে ভাত রাঁধিতে পারি। আলুর খোসা পর্যন্ত ছুলিতে শিখিয়াছি। সমস্যা মৎস্য লইয়া, তবে বলিতে দ্বিধা নাই, অখণ্ড মৎস্যের 'অ্যানাটমি' আধুনিকারাও সম্যক অবগত নহেন। কোথায় পায়ু, কোথায় পিত্তথলি। 'কাটাপোনা' ভিন্ন পৃথিবীতে আরও যে বহুবিধ মৎস্য আছে, ইহা তাঁহারা ভুলিতে বসিয়াছেন। এই সমস্যার সমাধান বাজারের পুরুষ মৎস্য ব্যবসায়ী আজও যেভাবে করিতেছেন ভবিষ্যতেও সেই ভাবেই করিবেন। আমার এক পুরুষবাদী বন্ধু একদা সগর্বে বলিয়াছিলেন— 'মেয়েরা আবার কবে রাঁধতে শিখলে! দৌড় তো ওই মাছের ঝোল, ভাত, আলু ভাতে, ঢেঁড়স ভাতে, আলু ভাজাটাও শিখলে না। টেস্টলেস ডাল। বললেই বলবে স্যুপের কায়দায় রান্না। শিল-নোড়ার ধারে কাছে যায় না তো বাটি-পোস্ত! আলো চালের পিণ্ডি পাকিয়ে বলবে, পিসপাস। দেখ গে যা, যত পাঁচতারা হোটেলের শেফ পুরুষ।'

নারীবিদ্বেষী পুরুষবাদী বন্ধুটি যাহা বলিয়াছিল তাহা আংশিক সত্য। নারীরা তাহাদের রিপাবলিকে প্রস্থান করিলে অসুবিধা তো কিছু নাই। কামার, কুমার, ছুতার, মজুর, মিস্ত্রি সবই তো পুরুষের কর্ম। এ দৃশ্য তো ভাবিতে পারি না, ভারা বাঁধিয়া চারতলার ছাতে উঠিয়া নারী রাজমিস্ত্রী সেন্টারিং করিতেছে, কী ধপাং ধপাং করিয়া ঢালাইয়ের মশলা পিটিতেছে।

যাহাই হউক তাহারা ভেন্ন হইয়া গ্যালে তাহাদের অসুবিধা অবশ্যই হইবে। বলা হয় অসুস্থ পুরুষের পার্শ্বে সারারাত্রি নারীই জাগিয়া থাকিয়া সেবা করেন। সুধীরলাল আবেগভরা কণ্ঠে গাহিলেন—'মধুর আমার মায়ের হাসি।' প্রশ্ন করিলাম, 'কে জেগে রয় দুখের রাতে।' অতীতের চিত্র। বর্তমানের ব্যবস্থা অন্যরূপ। পয়সা থাকিলে নার্সিংহোম, তাহা না থাকিলে সাধারণ হাসপাতাল। সেখানে সেবিকাদের সেবার নমুনা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আজ বেডপ্যান চাইলে পরের মাসে পাওয়া যাইতে পারে। রোগী 'ট্রাবলসাম' হইলে কিলাইবার ব্যবস্থাও আছে। বাস্তব যাহা তাহাই বলিলাম এই দুঃখের দিনে। স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া স্বামী দেহত্যাগ করিতেছেন, পুরাকালের চিত্র। মা জাতি অন্তর্ধান করিয়াছে। যামিনী রায়ের চিত্র। মাসির কোলে বাচ্চা রাখিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে 'ফ্লাইং কিস' ছুড়িতে ছুড়িতে স্বামীর স্কুটারের পশ্চাদ্দেশে তাহার ভুঁড়ি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া অফিসে যাইতেছে। মস্তকে একটি উপুড় করা গামলা।

মানবগোষ্ঠী স্ত্রী-পুরুষে সত্যই যদি বিভক্ত হয়, তাহা হইলে দেবীসকলকে প্রমীলা রাজ্যেই পাঠানো হইবে। মা দুর্গা, মা কালী, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, সব ওই দিকে। নারীকে দেবীরূপে আরাধনা করিয়াও আমাদের স্বভাব পাল্টাইল না। নারীশূন্য শ্মশানে আমরা ভোলা মহেশ্বরকে লইয়াই থাকিব। তিনিই প্রথম সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ড হইতে দিয়া আমাদের পুরুষবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রধান সমস্যা হইবে নারীর প্রতি আগ্রাসী আকর্ষণ। ইরেজিস্টেবল। হরমোন ঘটিত হাঙ্গামা। কণ্ঠে 'বয়সা' ধরিবামাত্র নারীসঙ্গের জন্য ধড়ফড় করিবে প্রাণ। করিবেই করিবে। ছবি দেখিতে ইচ্ছা করিবে। প্রেমের উপন্যাসে নগ্ন হইতে ইচ্ছা করিবে। ইহার হাত হইতে রক্ষার উপায় খুঁজিতে হইবেই। হিন্দি ছবির ডায়লগ উদ্ধৃত করিলে বলিতে হইবে—ইজ্জত কা সওয়াল।

শাস্ত্রের শরণ লইতে হইবে। আকর্ষণকে বিকর্ষণে আনিবার জন্য ঘৃণা উদ্রিক্ত করিতে হইবে। সাধকগণ দুইটি পথ অবলম্বন করিতেন, একটি পথ পূজার পথ। নারী মাতা, নারী দেবী, বেদিতে বসাইয়া পূজা করো। বলো, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। নারীর মুখপানে তাকাইও না। পদদ্বয়ে দৃষ্টি রাখো। মনে কু ইচ্ছা আসিলেই কুস্তি করো। মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন—'মনে কুবাসনা জাগিলেই, জোর করিয়া তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া অন্য কর্মে ব্যাপৃত হও, অধ্যয়ন করো, অথবা শ্রমসাধ্য এমন কোনও কর্ম করো, যাহাতে মন নিবিষ্ট হয়। দৃষ্টিকে প্রবণতার পথে যাইতে দিয়ো না। নারীর প্রতি পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া লও। সরাসরি কোনও মহিলা বা পুরুষের দিকে তাকাইবার প্রয়োজন কী।'

তুলসীদাসজিকে স্মরণ করিতে পারি। তিনি বলিতেছেন,

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনা মনকে বশ করে সো, সবকো সেরা ওই।।

পথটি সহজ নয়। লোলচর্ম বৃদ্ধ যুবতী দেখিয়া হাঁচড়-পাঁচড় করিয়া মরিল। রাজা দশরথের কী হইয়াছিল। যাঁহার 'হার্টে'র অবস্থা শোচনীয়, 'বাইপাস' করিলেই হয়, তিনি টঙ্কার মারিয়া চক্ষু উল্টাইলেন। মহাভারতের মুনিদের কথা স্মরণ করিতে লজ্জা হয়। ধুম্রজাল বিস্তার করিয়া রমণী রমণ করিতেছেন। স্নান করিতে গিয়া স্খলিতরেতঃ হইতেছেন।

দ্বিতীয় পথ, আত্মরক্ষার পথ। নারী আমাদের দুশমন। পিয়ারী দুশমন। রাজা অঙ্গধ্বজের কাহিনি পূর্বেই বলিয়াছি। তুলসীদাস পুরুষের স্বীয় আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিকে উসকাইয়াছেন। তোমাকে তিল তিল করিয়া মারিবার চেষ্টা

করিতেছে ছলনাময়ী, মোহময়ী। সেই গ্রাস হইতে নিজেকে মুক্ত করো। সাবধান হও। 'সাইরেনস কল'। সংযমের মাস্তুলে নাবিককে বাঁধিয়া রাখো। তুলসী বলিতেছেন—

'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলকপলক লহ চোষে।
দুনিয়া সব কউঝা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।।'

এই ঘৃণার ভাব আরও দৃঢ় করিবার মানসে শাস্ত্র পুরুষকে 'পোস্ট মর্টেম'-এর ডাক্তার হইতে বলিতেছেন। বিশ্বসুন্দরীকে ছুরি দিয়া ফালা ফালা করো, দেখো লালায়িত হইবার মতো কিছু আছে কি?

'অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাব দুর্গন্ধ নিরন্তকান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতা।।'

ইহার মধ্যে নারীবিদ্বেষ নাই। এই সবই নারীর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ হইতে দুর্বল পুরুষের বাঁচিবার প্রয়াস, রক্ষাকবচ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিচারের পথ দেখাইয়াছেন, বলিতেছেন বস্তুবিচার— 'সুন্দর দেহেই বা কী আছে। বিচার কর, সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র।' তিনি গৃহীদের পৌরুষ জাগাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি গালমন্দ করিতেন, বলিতেন, 'সব মাগের দাস। লোকে মাগ-ছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে বল।' বিজয়কৃষ্ণকে একদিন বলিয়াছেন, 'কামিনী-কাঞ্চন জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের মতো কাজ করতে পারো না।'

শ্রীরামকৃষ্ণই একালের আমাদের 'ফাইনাল সলিউশন'। ইহা আমি মনে করিয়া থাকি সেই কারণেই বলিলাম। তিনি সন্ন্যাসী হইতে বলেন নাই। সংসারে থাকিয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের প্রতি সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন ; কিন্তু একটি কবচ ধারণ করিতে হইবে। মাগের দাস হইও না। স্বরূপ ভুলিও না। নারীর দুই রূপ—বিদ্যারূপিণী, অবিদ্যারূপিণী। ইহার পর তিনি আমাদের চৈতন্যকে এই বলিয়া খোঁচাইতেছেন—'দেখ না, মেয়েমানুষের কী মোহিনী শক্তি, আবিদারূপিণী মেয়েদের (বিদ্যারূপিণী নয়)। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসে আছে, তখন বলি আহা! এরা গেছে—হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনিতে পেয়েছে। ওরে হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল, আর হারু কোথা গেল। সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে।

সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই। বটগাছের পেতনিতে হারুকে পেয়েছে। স্ত্রী যদি বলে, 'যাও তো একবার'—অমনি উঠে দাঁড়ায়, 'বসো তো'—অমনি বসে পড়ে।

তাঁর বিখ্যাত সেই উক্তি এই প্রসঙ্গেই, 'গোলাপকে ধর'। বড়বাবুকে ধরিলে কাজ হইবে না, ধরিতে হইবে তাঁহার রক্ষিতা গোলাপকে। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসরে লিখিত 'গিলগামেশ' উপাখ্যানে দেখা যাইতেছে, শাসক গিলগামেশ বন্যবীর এনকিভুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্বে, তাহার শক্তি হরণের জন্য এক রূপসীকে পাঠাইল। তাহার পর! যাহা হইবার তাহাই হইল, 'The whore untied her loin-cloth and spreaded her legs, and he took possession of her beauty.' ছয়দিন, ছয়রাত এনকিভু তাহাকে সম্ভোগ করিল। ইহার পর সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল যুদ্ধের জন্য, তাহার পদদ্বয় কাঁপিতেছে, দেহ টলিতেছে, নয়নে সরিষার ফুল দেখিতেছে।

আজীবন ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, যিনি কখনও নারী দর্শন করেন নাই, নিরন্তর সবিনয় ব্রতী, অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ প্রেরিত চিত্তোন্মাদক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বারাঙ্গনার রূপে মুগ্ধ হইয়া নাচিতে নাচিতে, আশ্রম, সাধনা সব ভুলিয়া অঙ্গরাজ্যে চলিয়া গেলেন। পরে কৌপীন ছাড়িয়া, বিবাহ করিয়া স্কন্ধে বাম্প চড়াইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তপস্যার বারোটা বাজিয়া গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আদৌ নারীবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি পুরুষকে পথে আনিতে চাহিয়াছিলেন। শূকরের সংসারকে শিবের সংসার, বিদ্যার সংসার করিতে চাহিয়াছিলেন। পুরুষ যদি আত্মবোধে জাগ্রত না হয়, তাহা হইলে নারী ভোগ্যসামগ্রীই হইয়া থাকিবে। মিনিটে একটি করিয়া ধর্ষণ হইবে। তিন হইতে তিয়াত্তর, কোনও মহিলাই রেহাই পাইবে না, বিলাতে যাহা হইতেছে। আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই অর্থে না হউক, যৌন অপরাধ সংঘটনে ভারত আমেরিকা হইয়া যাইবে। দাসত্বের যন্ত্রণা হইতে পুরুষকে মুক্তি দিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্ল্যানেড ফ্যামিলির' কথা অবিরত বলিয়া গিয়াছেন। চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছেন—'দেখ অত পাশ করা, কত ইংরাজি পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুট জুতার গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল কামিনী। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার জো নাই। তাই এত অপমানবোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।' তুলসীদাস এই একই কথা বলিলেন—'তিন বাতসে লটাপট হেয়, দামড়ি চামড়ি পেট।'

মাতা যেমন শিশুপুত্রকে বলিয়া থাকেন, 'চকোলেট খাচ্ছ খাও, পেছন চুলকু

করলে মাঝরাতে কেঁদো না।' তাহার ব্যাখ্যা এই নহে, মাতা চকোলেট-বিদ্বেষী। যখন বলেন, 'খাওয়াটা একটু কমান, ফ্যাট না কমালে, হার্টটা যাবে।' তাহার অর্থ এই নহে যে, অনাহারে শুষ্ক হইয়া যান। মাতা যখন যুবতী কন্যাকে বলেন, 'শেষ পর্যন্ত ওই লোফার ছেলেটার পাল্লায় পড়লি', তাহার অর্থ এই নহে যে তিনি পুরুষ-বিদ্বেষী। পুরুষদের মধ্যে যাহারা লোফার, তিনি তাহাদের বিদ্বেষী। পুরুষ প্রজাতির আধ্যাত্মিক মানবেরা, নিজ প্রজাতির গৌরব বর্ধনের জন্যই কামকে সংযত করিবার শত উপদেশ, শত কাহিনি বলিয়া গিয়াছেন। নিজ কন্যার সহিতও একই শয্যায় শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মুনিদিগেরও মতিভ্রম হইয়া থাকে। বরাহনগর মঠে বসিয়া রাখাল মহারাজ মাস্টার মহাশয়কে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন— 'অনেকে মনে করে মেয়েমানুষ না দেখলেই হল। মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নিচু করলে কী হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বললে, যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক, তা না হলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদবোধ থাকে না।'

কামটিকে ঝাড়েমূলে বিনষ্ট করিতে না পারিলে নারীদের প্রগতি বাড়িতেই থাকিবে। আমরা পারিলাম না। তুলসীদাস বলিয়াই গিয়াছেন—

'শাকট সূকট কুকুরা, তিনকে নত এক।
কোটি ভাঁতি সমঝাও, তৌ ন ছোড়ে টেক।।'

পাষণ্ড, শূকর ও কুক্কুট এই ত্রিবিধ প্রাণীই এক জাতির। উহাদিগকে কোটি কোটি সদুপদেশপূর্ণ, নম্র প্রিয় বাক্য বলো, তথাপি কোনওমতেই নিজ স্বভাব সংশোধন করিবে না। এরিক ফ্রম বলিলেন, 'Most people see the problem of love primarily as that of being loved rather than that of loving, of one's capacity to love.' আমরা ভালবাসা চাহিলাম। পাইলাম, খামচাইয়া-খুমচাইয়া শেষ করিলাম। ভালবাসিতে পারিলাম না। এখন পদাঘাতে জর্জরিত, অপমানিত। নারীরা পুরুষকে বাদ দিবেন। উত্তম প্রস্তাব। জীবন হইতে সরিয়া গেলে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত হইবে। 'লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছে হায়'—বলিয়া রামপ্রসাদী ভাঁজিতে হইবে না। বরং প্রাতে মুগুর ভাঁজিব। স্ত্রীর ভরণপোষণের অর্থে চিকেন তন্দুরি খাইব। তাকত বাড়াইব। ব্রহ্মানন্দে মশগুল হইবে। স্ত্রীর এমত উপদেশে নাচিতে হইবে না—'আমার মা তোমার মা, তোমার মা ভাগের মা।'

দুঃখের বিষয় তাহা হইবে না। দুইটি 'রিপাবলিক' হইতে পারে না।

'উটোপিয়া'। টমাস মোর যাহার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা স্বপ্নই। যাহা হইবে, বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর সহাবস্থান ও 'রোল রিভার্সাল' ভূমিকা বদল।

মধ্যরাত্রে তোয়ালের দ্বারা আবৃত নবজাতকটিকে কোলে ফেলিয়া, উঁহুঁহুঁ, উঁহুঁহুঁ করিতেছি, ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য শাবকটি তারস্বরে ওঁয়া ওঁয়া করিতেছে। কোমল থাকিবার চেষ্টা করিয়াও ক্ষিপ্ত হইয়া, শিক্ষা ভুলিয়া গ্রাম্য ভাষায় বলিয়া ফেলিতেছি, 'শালার ব্যাটা শালা'। পরক্ষণেই বুঝিতে পারিতেছি, আমার গাত্রে মাতৃগন্ধ নাই, আমার স্তন নাই। স্তন্যদায়িনী এই বলিয়া নিদ্রা গিয়াছেন— 'এইবার বোঝো, কত ধানে কত চাল!' তখন আমি নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বলিব—'হে ঈশ্বর আমার এই চাতালের মতো বক্ষদেশে পুরুষের দুটি চিরদুর্বলতা জুড়িয়া দাও। তাহা হইলে আমি আরও স্বাবলম্বী হইতে পারিব। আমেন!'

আনন্দভবন

ফ্ল্যাট কালচারের যুগ বলে কথা।

উঁকি না মারলে বোঝার উপায় নেই কোথায় কী ঘটছে? সেটাও আবার মোটের উপর ভাল কম্ম নয়। পাড়ার রক অদৃশ্য হয়ে যেমন তেমনই উধাও হচ্ছে কাকিমা-জেঠিমার জটলা। হাতা-খুন্তির গল্পে ভরা পোঁটলা খোলার দিন শেষ গো। যত চাল-কৌশল সবই কথা বলা বাক্সে। হাজার চ্যানেল হাজার মজা সিরিয়াল। বাপ রে বাপ, সারাটা দিন ধরে সংলাপ, প্রতিসংলাপ গমগমে জমজমাট। সে সব থেকে জ্যারা হঠকে আমাদের মিত্তির বাড়ি। এই পাড়ায় নতুন নতুন আধুনিক কায়দায় অনেক বাড়ি হয়েছে। কিন্তু মিত্তির বাড়ি তার বনেদি চেহারাটি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

অনেকে বলেন এই ধরনের বাড়ি আর তৈরি হবে না।

বিশাল চকমেলানো বাড়ি। চারপাশে বাগান, প্রাচীন আম গাছ, সারি সারি নারকেল গাছ। ভিতরে ঢুকলে দেখতে পাওয়া যাবে লিচু, জাম, পেয়ারা, সবেদা কী নেই। সারা বছরের ফলের জোগান দিচ্ছে এই বাগান। রায়বাহাদুর বিনোদ মিত্রের তৈরি এই বিশাল বাড়ি আজও জরাজীর্ণ হয়নি। তার কারণ বিনোদবাবু তাঁর ছেলেদের মানুষ করে গিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে জানেন। আনন্দে থাকে, এই পাড়ার সকলকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করেন। নিজেদের মধ্যে কোনও বিবাদ নেই, কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই। হিংসা নেই, বড় ভাইকে নেতা করে এরা এই ভাঙনের যুগে প্রমাণ করেছেন—শুধু পয়সা থাকলেই হয় না, শিক্ষা এবং সদ্ভাব না থাকলে সব থেকেও ধ্বংস অনিবার্য। এই মিত্তিরদের নামে পাড়াটার নামও মিত্তির পাড়া। মূল রাস্তাটির নামও বিনোদ মিত্র স্ট্রিট।

না আর দেরি নয় আমরা এবার বড় গেট ঠেলে সুরকি ঢালা লাল পথ মাড়িয়ে দু'পাশে ফুলের বাগানের শোভা দেখতে দেখতে বড় বড় সাত ধাপ সিঁড়ি ভেঙে মিত্তিরদের বৈঠকখানায় ঢুকে যাই।

ছবি তোলা হচ্ছে। ফোটোগ্রাফার স্ট্যান্ডে ক্যামেরা ফিট করছেন। সোফায় পরিবারের সকলে বসেছেন, বোঝাই যাচ্ছে একটা টাইট গ্রুপ ফোটো তোলার চেষ্টা হচ্ছে। গ্রুপটাকে ঠিকমতো ফ্রেমে আনতে পারছেন না ফোটোগ্রাফার। তাঁর নির্দেশ শোনা গেল, 'একটু সরে, বড়দা একটু ডানদিকে, উঁহু বাঁয়ে যাচ্ছেন কেন?'

বড় মিত্তির বললেন, 'কার ডানদিকে? আমার না তোমার। শোনো, নির্দেশ

যখন দেবে—পরিষ্কার নির্দেশ। তোমার মাথায় এক, বলছ আর এক।' তোমার কি বলা উচিত ছিল—'বড়দা, আপনার ডান দিকে একটু সরে। রাইট!'

মেজ মিত্তির একটু মুচকি হেসে বললেন, 'শুরু হয়ে গেল ভাই, স্ট্যান্ড থেকে ক্যামেরাটা নামিয়ে কাছে এনে একটা মাইক্রোফোন ফিট করে দাও। আধঘন্টা ধরে উচিত-অনুচিতের লেকচার হোক।'

একটা মাত্র বোন। ডাক নাম কুসি। পাড়ায় খুব সুনাম। শিক্ষিতা, সুন্দরী, পরোপকারী। ব্যক্তিত্বসম্পন্না। মিত্তির বাড়িটিকে মুঠোয় ধরে রেখেছেন। অভিভাবিকা, বিবাহ করেননি। করবেনও না। ভাইদেরকে সামলানোর দায়িত্ব আনন্দে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এক বাক্যে সবাই বলেন 'জ্যান্ত দুর্গা।'

কুসি বললে, 'আধঘন্টা হয়ে গেল, ঝড়ের এঁটো পাতার মতো একবার ডান থেকে বাঁ, বাঁ থেকে ডান। এই হচ্ছে। আমাদের কাজ কর্ম নেই না কি? ফোটো হওয়ার জন্যে জন্মেছি।' বড় মিত্তির বোনকে সমর্থন করে বললেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো! শোনো গ্রাস হপার, আমার মনে হচ্ছে, পাশাপাশি স্ট্রেট লাইনে দাঁড়ালে ভালো হতো।'

বড় মিত্তির যাকে যা খুশি নামে ডাকেন। মজার মজার নাম। যাকে ডাকেন সে-ও বেশ মজা পায়। ফোটোগ্রাফারের এই মুহূর্তে নাম হল গ্রাস হপার।

মেজ মিত্তির বললেন, 'তোমার মুণ্ডু হতো। এত বড় একটা গ্রুপ। এটাকে ফ্রেমে আঁটতে গেলে অর্ধচন্দ্রাকারে, ঘোড়ার ক্ষুরের নালের আকারে, কাণ্ডের আকারে ....'

'তোর মতো একটা ইডিয়েটের মাথার আকারে....'

'তোমার মতো একটা পণ্ডিত মূর্খের নির্দেশে...'

'ক্লিক' শব্দ, ফ্ল্যাশ।

কুসি বললেন, 'যাঃ, মেরে দিয়েছে।'

ফোটোগ্রাফারের আসল নাম কুন্তল। বিখ্যাত বাজারের মোড়ে দোতলা স্টুডিও। ফরাসি নাম, 'স্টুডিও মমার্ত'। ঝকঝকে।

কুন্তল বলল, 'জাস্ট এইটাই চাইছিলুম দিদি। মিত্তির বাড়ির মুড। চনমনে। ভাইব্রান্ট।'

গ্রুপ ভেঙে ছড়িয়ে গেল। কে কে ছিলেন, বড় থেকে ন, সব ক'জন ভাই। সেজ বউ, ন বউ। তাদের একটি ছেলে। একটি মেয়ে। আর বোন কুসি।

মেজ বড়কে বললে, 'বড়দা! তুমি এখনও মুচকি হাসি হাসছ কেন?'

'অফ করতে ভুলে গেছি। ছবি তোলার সময় অন করেছিলুম। দেখবি, আলো আর হাসি, যে অন করে সে খুব খেয়ালদার না হলে অফ করতে ভুলে

যায়। তুই তো করিসই না। বাথরুমের আলো কাজ হয়ে যাওয়ার পর নেভানোটা যে শিক্ষিত মানুষের কর্তব্য—সেটা তোর শাস্ত্রে লেখেনি।' বড় মেজকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কুন্তলকে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ তুমি ছবি তুললে কেন?'

'বড়দা! লাস্ট ফিল্মটা একস্‌পোজ করে দিলুম। এইবার রিলটা বের করে ওয়াশ করব।'

মেজ বলল, 'একেই বলে, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।'

বড় বলল, 'ইনসালটিং। একজন আমাদের ভালোবাসে বলেই বাড়ি বয়ে এসে ছবি তুলে দিলে, তাকে এই কথাটা বলা মানে অপমান করা, ব্যাড কালচার।'

মেজ বললে, 'কুন্তল আমার ছাত্র ছিল। ওকে একসময় আমি বাঁদর, উল্লুক, গাধা, থ্রি ইন ওয়ান বলেছি। আমার সে অধিকার আছে।'

বড় বললে, 'কুন্তল আমার পেশেন্ট। প্রেমের পক্ষাঘাত থেকে সবে আমি ওকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়েছি।'

'প্রেমের পক্ষাঘাত জিনিসটা কী?'

'ও আমাদের পাড়ার এক নম্বর সুন্দরী চন্দ্রাকে বেকায়দায় ভালোবেসে ফেলেছিল। ভালোবাসার কনস্টিপেশান।'

'দুটো শব্দ একটু ব্যাখ্যা করতে হবে, বেকায়দা আর কনস্টিপেশান।'

'বেকায়দা মানে চন্দ্রা ওর স্টুডিয়োয় ছবি তুলতে এসেছিল। কুন্তল তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে, নয়নতারা করে ছবি তুলেছিল।'

'নয়নতারা মানে?'

'ওর একটা অ্যালবাম আছে। সিনেমার অভিনেতা, অভিনেত্রীদের ছবি আছে। নয়নতারা, পদ্মকলি, জাফরানি, গুল-এ-বকাবলি। যে যেমন হতে চায়, তাকে সেই রকম সাজিয়ে দেয়। চুল ঠিক করে, টিপ পরায়। চন্দ্রাকেও তাই করতে গিয়ে একেবারে চন্দ্রাহত। শয়নে-স্বপনে, জাগরণে চন্দ্রা। চন্দ্রার ছবি সামনে রেখে ধ্যান। বললেই পারত, আই লাভ ইউ। এই বলতে না পারাটাই কনস্টিপেশান। বুকের কাছে আটকে রইল। ভালোবাসার কনস্টিপেশান। এদিকে চন্দ্রা বিয়ে করে চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ফুল-সাজানো গাড়িতে। আবার ছবিঅলাদের এমনই বরাত, চন্দ্রার বিয়ের সব ছবিও ওকেই তুলতে হল। নার্ভ বিগড়ে গেল। চোখ উলটে গেল। ঘুম নেই। কে-ই বা আছে, কাকেই বা বলবে। মানুষের সুখ-দুঃখের কথা শোনার মতো একজনই আছে—সে আমি। মানবদরদি মিত্তির ডাক্তার।'

'বড়দা! আমিও দরদি। আমার হৃদয়টা যে কত বড়, আমি নিজেই ভেবে পাই না। ওই জন্যে আমার ঘাম বেশি।'

'সে আবার কী?'

'ওই তো ভাই। জলের খেলা। চোখ দিয়ে বেরোতে পারে না বলেই সর্বাঙ্গ দিয়ে বেরোয়। মানুষের দুঃখে গোটা দেহটাই কাঁদতে থাকে। আমি এই ফাগুনেই কুন্তলের বিয়ে দেবো। চন্দ্রার চেয়েও সুন্দরীর সঙ্গে।'

'ও তো স্ট্রেট বিয়ে করবে না। সে করলে তো হয়েই যেত। ও প্রেমিক। প্রেম করবে। তারার চুমকি বসানো আকাশের নিচে/ ছোট্ট শান্ত এক নদী/ একটি নৌকা/ পাশেই একটি উদ্যান।/ফুলে ভরা গাছ/ রাত জাগা ফুলের হাহাকার সুগন্ধ/ কেউ কোথাও নেই। তরঙ্গের গল্প-কথা/ রাত গভীর হয়ে আসে/মৃদু বাতাসে জড়ানো ঘুমের নীল আরক/ চাঁদের আলোর রঙের শাড়ি পরে/ সে এসে বসেছে পাশে/গোল গোল হাতে রুলি/ লাল, নীল, সাদা পাথরে আলোর চমক/ নাকের ছোট্ট হিরে, চোখের দুটো কালো মণি, একই কথা বলে/ ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।'

'ভালো হয়েছে। এদিক, ওদিক একটু কারেকশান করে দিলেই, পাড়ার পুজো স্যুভেনিরে ছেপে দেওয়া যাবে। আচ্ছা বড়! তুই কোনও দিন প্রেমে পড়েছিস? সত্যি কথা বলবি।'

'সে যদি বলিস, আমি পড়িনি, আমার প্রেমে একজন পড়েছিল। ভবানীপুরের রুবি।'

'কেসটা ক্লিয়ার করে বল। আজ ওয়েদারটা ভালো।'

'সেকেন্ড ইয়ারে পরিচয় হল। বড়লোকের মেয়ে। গাড়ি করে কলেজে আসে। একদিন হঠাৎ আমাকে বললে, তুমি কি পাগল? আমার একটুও রাগ হল না। বললুম, হ্যাঁ, আমি পাগল। কোনও কথা না বলে গটগট করে গাড়িতে গিয়ে উঠল, চলে গেল।'

'একে বলে প্রেমে পড়া?'

'এখনও শেষ হয়নি। পরের দিন জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি নির্বোধ বালক? আমি ইংরেজিতে বললুম, ইয়েস। চলে গেল। তৃতীয় দিনে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি শিব। বললুম, জানি না। চতুর্থ দিনে হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বললে, পরে পড়বে। চলে গেল। কাগজের মোড়কটা খুললুম, লেখা আছে, আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।'

গান্ধারী এই বাড়ির সকলের অতি প্রিয় অ্যাসিসটেন্ট, চায়ের ট্রে হাতে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'আমিও ভীষণ ভালোবাসি। বড়দা। আই লাভ ইউ। তুমি

আমার বাচ্চা ছেলে। আমি তোমার মা। ঘরে ত্রিফলার জল রেখে এসেছিলুম, খেয়েছিলে?'

'যাঃ।'

'তোমার মতো ছেলেকে নিয়ে আমি আর পারি না। আমি এইবার বৃন্দাবন চলে যাব।'

পটাপট সকলের সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে গান্ধারী চলে গেল। খুব সুন্দরী। কুন্তলের চন্দ্রার চেয়েও সুন্দরী। গান্ধারীর বয়েস যখন দশ কি বারো, বড় মিত্তির তাকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। মাতাল বাপের রোজগার ছিল না। হাঁপানিতে মরল। ভদ্রলোক মা-টাকে আগেই শেষ করে দিয়েছিলেন। বনেদি বাড়ির ছেলে। বিষয় সম্পত্তি সবই ছিল। মাথায় ঢুকলো বায়োস্কোপ। এক ধূর্ত ডিরেক্টার লোকটাকে 'মুরগি' করে দিলে। বিষয় সম্পত্তি এক অবাঙালি মানিলেন্ডারের কাছে বাঁধা রেখে টাকা নিয়েছিলেন। বই 'ফ্লপ'। তিন দিনেই সব হাউস থেকে উঠে গেল। ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে মারা গেলেন। পড়ে রইল গান্ধারী। মেয়েটার দিকে অনেকেরই নজর ছিল। বড় মিত্তিরের বন্ধু এক পুলিশ অফিসার গান্ধারীকে উদ্ধার করে বড় মিত্তিরের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, মেয়েটাকে মানুষ করো ধর্মের ষাঁড়। গান্ধারী এখন এই বাড়ির এক অভিভাবিকা।

মেজ মিত্তির চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আঃ ফাসক্লাস। গান্ধারীটা গডেস। তারপরে বল্, চিরকুটটা পেয়ে তোর কী হল?'

'টাইফয়েড হয়ে গেল।'

'সে আবার কী?'

'রাত্তিরে কেঁপে জ্বর এল। মা বললেন, ম্যালেরিয়া। বাবা বললেন, ম্যালেরিয়ার জ্বর দুপুরে আসে, রাত্তিরে আসে না। মায়ের কী অসাধারণ যুক্তি। বললে, ট্রেন লেট করেছে। বাবার সে কী হাসি! হাসছেন আর বলছেন, হাতা-খুন্তি ছেড়ে তুমি লেখিকা হও। তোমার এত সেন্স্ অফ হিউমার।'

'সেই লাভলেটারটা তখন কোথায়?'

'বালিশের তলায়। পরের দিন ডাক্তারবাবু এসে বললেন, কিপ আন্ডার অবজার্ভেশান। পেট ফেঁপে আছে। চারদিকে খুব টাইফয়েড হচ্ছে। হলও তাই। জ্বর বাড়ছে। জ্বর কমছে। রেমিশান হচ্ছে না।'

'তারপর?'

'একুশ দিন পরে জ্বর ছাড়ল। দুর্বলতা কাটতে একমাস।'

'তারপর দেখা হল?'

'কেন?'

'লস অফ মেমরি। টাইফয়েড হলে, একটা না একটা কিছু যাবেই।'

'ছোটোলোক।'

'কে?'

'তুই, তুই। একটা মেয়ের আত্মনিবেদন এইভাবে ছোটোলোকের মতো প্রত্যাখ্যান করলি। পদদলিত করলি পূজার ফুল।'

'সে এখন কোথায় জানিস? ইংল্যান্ডে। বিশাল বড় ডাক্তার। কলকাতায় এক সেমিনারে পেপার পড়তে এসেছিল। আমিও ছিলুম। আমাকে চিনতেই পারলে না। পাশে বসে লাঞ্চ করলে। একটাই কথা বললে, প্লিজ, নুনের জায়গাটা একটু এগিয়ে দিন না।'

'চোখের দিকে তাকিয়েছিলে?'

'না। সামনে ভালো ভালো খাবার। সেই দিকেই তাকিয়েছিলুম।'

'পেটুকের ধর্ম। চোখের দিকে তাকালে দেখতে পেতে জলে ভরা টলটলে অতীত।'

বড় বললে, 'কী যে করিস মেজ? খরচ বাড়িয়ে দিলি।'

'কেন, কেন?'

'জল ভরা তালশাঁস সন্দেশের কথা মনে পড়ছে। গোটা চারেক মিনিমাম।'

কুন্তল বহুক্ষণ ধরে কী একটা বলব, বলব করছিল। এইবার বলেই ফেলল, 'বড়দা! নাচছে।'

'কে নাচছে? কী নাচছে? ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, মণিপুরী, কত্থক?'

'না দাদা, চোখের পাতা। কেবল নাচছে।'

'কোন্ চোখ?'

'ডান চোখ?'

'ডান।'

'নাচতে দাও। লাভ হবে। যত নাচবে, তত টাকা। এই নাও, পাঁচশো।'

বড় একটা পাঁচশো টাকার নোট এগিয়ে দিল।

কুন্তল অবাক হয়ে বললে, 'কী করব?'

'ছবি তুললে টাকা নেবে না?'

'না। তাহলে আপনাকেও টাকা নিতে হবে। বিনা পয়সায় কত চিকিৎসা করেছেন!'

'কথাটা বললি বটে, কিন্তু বেখাপ্পা শোনাল। সেই গিভ অ্যান্ড টেক। ফ্রি-র বদলে ফ্রি। তাহলে এক কাজ কর, জল-ভরা।'

'পাঁচশো টাকার জল-ভরা?'

'পরিবারের লোকসংখ্যাটা একবার হিসেব কর, আমাদের বাড়ি, তোর বাড়ি। গান্ধারীটা তো একাই চারটে মেরে দেবে।'

কুসি হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল, 'এখনও সব বসে আছ? আজকের দিনটা ভুলে গেলে!'

মেজ বললে, 'ভুলব কেন? আজ বুধবার। কাল মঙ্গলবার ছিল। মাত্র তিনটে ক্লাস।'

মেজ অধ্যাপক। ক্লাসের হিসেব হচ্ছে।

কুসি বললে, 'আজ রেখার জন্মদিন। খেয়াল আছে?'

মেজ বললে, 'বড়! তোর খেয়াল আছে?'

বড় বললে, 'তোর আছে?'

কুসি রেগে ঘর থেকে চলে গেল। বড় আর মেজ মুখোমুখি। কুন্তল পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাচ্ছে। বড় বললে, 'যাচ্ছিস কোথায়? বোস।' কুন্তল বসে পড়ল।

মেজ হতাশ গলায় বললে, 'বড়! আমাদের মাথার অবস্থা দেখেছিস। ভুলে মেরে দিয়েছি। শেম! শেম!'

'আমি মনে রাখতে রাখতেও লাস্ট মোমেন্টে ভুলে গেলুম। এই কুন্তলটাই দায়ী।'

'আমি কী করলুম দাদা?'

'ওই যে প্রেম করলি।'

'প্রেম তো আপনি করলেন দাদা।'

'তুই করলি বলে আমাকে করতে হল।'

মেজ বললে, 'কাজের কথায় এসো। একটা কিছু তো দিতে হবে।'

'অবশ্যই।'

'এক সঙ্গে না, আলাদা, আলাদা?'

'আলাদা, আলাদা। এ তোর বন্ধু-বান্ধবের জন্মদিন নয়, যে চাঁদা তুলে একটা গামলা কিনে দিয়ে আসবে।'

মেজ বললে, 'তা হলে কী দেওয়া যায়। সাংঘাতিক একটা শাড়ি।'

'অনেক আছে। এত আছে যে একটা দোকান দিতে পারে।'

'ভালো ভালো বই। রচনাবলি দু-সেট।'

'কেউ পড়ে না। তোকেই পড়তে হবে রাত জেগে।'

বড় মিত্তির সারা ঘরে পায়চারি করছে, আর বলছে—'এমন একটা কিছু, এমন একটা কিছু, এমন একটা....।'

মেজ মিত্তির সোফা ছেড়ে উঠে, দাদার পিছন, পিছন 'এমন একটা কিছু, এমন একটা কিছু....'।

দূর থেকে দেখলে মনে হবে, দুজন লামা মন্ত্র জপ করতে করতে পায়চারি করছেন। বৌদ্ধরা যাকে বলেন—চংক্রমণ।

হঠাৎ দুজনে মুখোমুখি। নাকে নাকে ঠেকাঠেকি। সমস্বরে—'যা কাজে লাগে। এমন একটা কিছু যা কাজে লাগে।'

দুজনে সমস্বরে, 'গান-ধারী।'

'যাত্রা হুঁ ম্যায়।'

গান্ধারী তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এল, 'বলো, কী আদেশ? চা?'

বড় বললে, 'কাছে আয়।'

গান্ধারী সরে এল।

'তোর ন বউদির কী নেই? চিৎকার করবি না। ফিস ফিস করে বল।'

গান্ধারী ফিস ফিস করে বললে, 'ছেলে নেই। ছেলের খুব শখ।'

বড় বললে, 'ছেলে? ছেলে কোথায় পাব! কত বড় ছেলে?'

মেজ বললে, 'ধুস, কী যে বল? এ-ছেলে সে-ছেলে নয়। ভিতরের ছেলে। মানুষের ভিতর থেকে মানুষ বেরোয় না। এতটুকু, এতটুকু! লাল, লাল। ওঁয়া, ওঁয়া।'

বড় বুঝতে পেরে, 'ওঃ হো। সেই ছেলে। সন্তান, সন্তান! এইটুকু থেকে তোর মতো এত বড় একটা দামড়া! সে তো মানুষের হাতে নেই।'

গান্ধারী বললে, 'আছে বড়দা, আছে। মাদুলি। আমার কাছে তিনটে আছে।'

'তোর কাছে আছে কেন?'

'আমাকে আমার মা দিয়েছিল। মাকে দিয়েছিলেন এক তান্ত্রিক। ক্যাঁকশিয়ালিঘাটের তান্ত্রিক। এই বিরাট শরীর। লাল, ঢ্যালা ঢ্যালা দুটো চোখ। এতখানি একটা বুক। মাথায় জটা।'

'কী বললি, ক্যাঁকশিয়ালি। সে আবার কী? খ্যাঁকশেয়াল শুনেছি।'

'আরে বাবা চুঁচড়োয়, গঙ্গার ধারে একটা ঘাট আছে—ক্যাঁকশিয়ালির ঘাট। সেখানে বিশাল একটা বটগাছ আছে। তার তলায় সতীদাহ হতো। অমাবস্যার রাতে একবার গিয়ে দেখো না। ভয়ে ভিমরি খাবে।'

মেজ মিত্তির বললে, 'নাঃ, তোকে আর শিক্ষিত করা গেল না। ভিমরি নয় ভিরমি।'

'কী করব মেজদা? র-টা আমার হড়কে যায়।'

'আজও তুই পিঁপড়ে বলতে পারিস না, বলিস পিঁড়পে।'

গান্ধারী মাদুলির বর্ণনা দিচ্ছে, 'ভূত চতুর্দশীর তিন প্রহর রাতে শেয়ালের ডাক শুনে কাজ আরম্ভ করতে হয়।'

বড় জিজ্ঞেস করলে, 'কী কাজ?'

গান্ধারী বললে, 'সে আমরা কী জানি। এক একটা মাদুলির খরচ পড়ে যায় পাঁচশো-হাজার। যে যেমন পাওয়ারের নেবে। এর পর বাইরের সাজ। তুমি মালটাকে তামার মাদুলিতে ভরতে পার, রুপোর মাদুলিতে ভরতে পার, সোনার মাদুলিতে। যার যেমন পয়সার জোর। মেয়ে হওয়ার মাদুলির খরচ অনেক কম। মাত্র একশো টাকা। এক হাত লাল সুতো ফ্রি।'

মেজ বললে, 'কী বড়দা? দেবে না কি? তুমি একটা, আমি একটা'।

বড় বললে, 'তাহলে যমজ হয়ে যাবে। সে কি সামলাতে পারবে? বরং আমি ভিতরটা দি, তুই বাইরেটা দে। একটা সোনার মাদুলি আর কত নেবে? হাজার পাঁচেক।'

মেজ বললে, 'না, আমি ভিতর, তুমি বাইরে।'

'না, তুই বাইরে, আমি ভিতরে।'

'না। আমি ভিতর, তুমি বাইরে।'

'বাইরে।'

'ভিতরে।'

বাইরে, ভিতরে, বাইরে ভিতরে....

গান্ধারী বললে, 'উরেব্বাস রে এ কী শুরু হল! যাই কুসি দিদিমণিকে ডেকে আনি।

মেজ দৃঢ় গলায় বললে, 'আমি ভিতরে থাকায় অবিচল।'

বড় চিৎকার করে উঠল, 'আমি বাইরে যাব না, যাব না, যাব না।'

কুসি ঘরে ঢুকেই বললে, 'তোমরা দু'টোতেই বাইরে যাও। বেরোও। গেট আউট। দুটো দামড়া হলো। মুখোমুখি হল তো ফ্যাঁসফোঁস। যাও যাও। রাত দশটার আগে দু'জনের মুখ যেন না দেখি।'

বড় মিত্তির বললে, 'কুসি তুই এসেছিস, শোন্, এ বাইরে সে বাইরে নয়রে। এ হল মাদুলির বাইরে।'

'কিসের মাদুলি?'

'সোনার মাদুলি।'

মেজ মিত্তির ধড়ফড় করে বললে, 'আমি ভিতরে হাজার, আর বাইরে চার হাজার।'

বড় বললে, 'না, আমি ভিতরে হাজার, আর বাইরে চার হাজার।'

মেজ বললে, 'কান্ট বি'।

বড় জোর গলায় বললে, 'উইল বি'।

কুসি খুব ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'কিসের মাদুলি বলো তো, কই দেখি মাদুলিটা।'

মেজ বললে, 'সে তো স্যাকরার দোকানে, আমাকে কিনতে বলছে।'

কুসি বললে, 'কিনতে বলছে কেন?'

মেজ বললে, 'ওর মধ্যে মন্ত্রপূত গান্ধারী ঢুকবে।'

কুসি অবাক হয়ে বললে, 'সে আবার কে?'

বড় হাত তুলে শান্ত গলায় বলল, 'ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ার করছি। ও উত্তেজিত হয়ে আছে তো, তাই সব গুলিয়ে ফেলছে। শোনো, মাদুলির মধ্যে থাকে গান্ধারীর শ্মশান।'

কুসি আরও ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'গান্ধারীর শ্মশান! শ্মশান থাকবে মাদুলিতে! গান্ধারীটা কে?'

মেজ বলল, 'আরে আমাদের গান্ধারী, মহাভারতের গান্ধারী নয়।'

কুসি গলা চড়িয়ে ডাকল, 'গান্ধারী'।

'হ্যাঁ দিদি', গান্ধারী দৌড়ে এল।

কুসি জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার'?

গান্ধারী বেশ বিজ্ঞের মতো বলল, 'যত দূর বুঝেছি, এরা ন বৌদিকে মাদুলি পরাবে।'

কুসি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? এত লোককে টুপি পরিয়ে হল না, এখন মাদুলি পরাবে ন বউকে।'

গান্ধারী কুসির কানে কানে কী বলল। কুসি ভাইদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে ছিঃ ছিঃ, তোমাদের লজ্জাশরম সব গেছে। সময়ে বিয়ে না করলে মানুষের এই অবস্থাই হয়। অসভ্য, ইতর।'

দু'ভাই কোরাসে বলে উঠল, 'লে হালুয়া, আমরা কী জানি। গান্ধারীই তো বলল।'

গান্ধারী বলল, 'বা, আমি বললুম, না তোমরাই আমাকে ডেকে বললে— বলো তো গান্ধারী, ন বউ-এর কী নেই? আমি বললুম, ছেলে নেই। যা নেই, তা নেই, সত্যিই তো নেই, আমি কি মিথ্যে বলব। সে মেয়ে আমি নই। আমার গুরু পঞ্চানন।'

ন বউ চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'দিদি পুরটা হয়ে গেছে।'

কুসি ট্রেটা ধরে নিয়ে বলল, 'তুই এখুনিই এখান থেকে চলে যা, এ দু'টো অ্যান্টিসোস্যাল হয়ে গেছে।'

ন বউ দু'জনের দিকে তাকাতে তাকাতে ভয়ে ভয়ে চলে গেল।

বড় মিত্তির বলল, 'দেখলি তো মেজ, কী যুগ পড়েছে। ভালো করতে গেলে মন্দ হয়, একেই বলে কলির শেষ। এই ব্যাটা গান্ধারীই বললে, আমার কাছে শ্মশানের বীজ আছে, সোনার মাদুলিতে ভরে ডান হাতে বেঁধে দাও। বীজের দাম হাজার, মাদুলি চার হাজার। বছর না ঘুরতেই, দোল দোল দোল দুলুনি/রাঙা মাথায় চিরুনি।'

গান্ধারী চোখ বড় বড় করে বলল, 'ও বাবা কী মিথ্যে কথা'।

বড় বলল, 'মেজ তুই সাক্ষী।'

মেজ অম্লানবদনে বলল, 'গোছগাছ করে এতটা বলেনি।'

বড় বলল, 'এখন দলত্যাগ করিস না পাঁঠা। ফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখ।'

মেজ স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ইউপিএ জিন্দাবাদ।'

কুসি গান্ধারীকে বলল, 'তুই সম্বারটা বসা। এ দু'টো পাগল। তোমাদের আমি বিয়ে দেব, তবে যদি টিট হও।'

বড় খুব দুঃখের গলায় বলল, 'আমার একজন প্রেমিকা ছিল রে কুসি।'

মেজ বলল, জানি, মণি পাগলি। তোমাকে দেখলেই গান ধরত—ও দয়াল বিচার কর, আমায় গুণ করেছে আমায় খুন করেছে।

বড় মিত্তির উদাস গলায় বললে, 'না রে না। সে কোন্ দূর অতীতের কথা। ডাক্তারি পড়ছি। সেকেন্ড ইয়ারে যে দূরে ছিল, থার্ড ইয়ারে সে কাছে এল। সরে এল মৃদু, মৃদু হাসি নিয়ে।'

'সেই গানটার মতো।' মেজ সুর করে গেয়ে উঠল, 'বৈশাখে দেখা হল, জ্যৈষ্ঠে হল পরিচয়, আসছে আষাঢ় মাস, মন তাই ভাবছে, কী জানি কী হয়।'

'অনেকটা তাই। তার নাম কবিতা। অসাধারণ অ্যানাটমি। যখন দূরে ছিল, আমরা মানে ছেলেরা কিছু অশালীন কথাবার্তা নিজেদের মধ্যে চালাচালি করেছি। যেই সে প্রেম হয়ে কাছে এল তখন নিজেকে ধিক্কার দিলুম ছিঃ ছিঃ ছি ছি। মেয়েরা শুধু অ্যানাটমি নয়, বোট্যানি, অরিগ্যামি। ফুলের মতো। বর্ষার বনানী, শরতের আকাশ, হেমন্তের শিশির, বসন্তের বাতাস। মেজ! আই মে বি এ ডক্টর, বাট বেসিক্যালি এ পোয়েট। আমিও গাইতে পারি সুইট ব্রাদার। শুনবে,'

'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিইনি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে।

সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন নিশীথ তিমিরে বিলীন
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা।'

বড় মিত্তির ইচ্ছে করলে গায়ক হতে পারত। মাতুল বংশের প্রতিভার উত্তরাধিকারী। সেই বংশের সবাই বড় বড় গাইয়ে। কুসির চোখে জল।

মেজর প্রশ্ন, 'কাঁদছিস কেন?'

কুসি চোখ মুছে বললে, 'কবিতার মতো মেয়ে হয় না। তুই দেখিসনি তাকে।'

'কেন দেখিনি?'

'তুই তখন বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিতে। কতবার এই বাড়িতে এসেছে থেকেছে। রাত্তিরবেলা আমার পাশে শুয়ে, কতরকমের গল্প। একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ত। বালিশে মাথা, চাঁদের আলো পড়েছে মুখে। রূপকথার পরি। অদ্ভুত, অলৌকিক, নিঃশ্বাসে ধূপের গন্ধ। জানতুম এ মেয়ে এই পৃথিবীতে বেশি দিন থাকার জন্যে আসেনি।'

মেজ বলল, 'কী হল?'

'ভাইর‍্যাল ফিভারে মারা গেল। এ সব কথা কেন? কেন এল?'

বড় মিত্তির গান ধরল,

'হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দেরে, দেরে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।।'

গান্ধারী দৌড়ে এসেছে। হাতে একটা হাতা। 'বড়দা! এ গানটা তুমি আমার সঙ্গে 'কোরাসে' গাও। আজ 'সোলো' কেন।' গান্ধারী হাতা হাতে নাচতে লাগল।

'ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধন হারা।
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।।
হারে রে রে রে রে, আমার রাখবে ধরে কে রে—

যাঃ সব বুঝি পুড়ে গেল, রে রে রে রে। গান্ধারী নাচতে নাচতে রান্নাঘরের দিকে ছুটল।

বড় বলল, 'না! দুঃখ করব না। নো চক্ষুপানি। দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, বিয়ে করে প্রেমের মতো সুন্দর একটা জিনিসকে নষ্ট করব না। প্রেমকে মুরগি করে জবাই করে, পালক ছাড়িয়ে চিলি-চিকেন বানাব না। বিরহী যক্ষ, 'কোকিল আমাদের আদর্শ। আমাদের গুরু রবি কবি।'

'আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো।

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।।'

'তাহলে তোমার একটা নয় দু'টো প্রেম।'

'ধুর! প্রথমটা তো প্রেম নয় টাইফয়েড। টাইফয়েডে মানুষ মরে যায় আমি বেঁচে গেলুম। ওই অহঙ্কারীর পাল্লায় পড়লে আমাদের যে কী হতো?'

'কুসি মেরামত করে দিত।'

'কুসিকেই মেরামত করে দিত। আমলার মেয়ে। বাবা! আমলা দেখেছিস?'

'স্ত্রীলিঙ্গ দেখেছি। আমলকি। বায়ু, পিত্ত, কফ দমনকারী, অতিশয় উপকারী।'

'তুই একটা বিয়ে করলে পারতিস। সেকালে এক একজন কুলীন একশো, দেড়শো বিয়ে করত। রাত্তিরবেলা রোল কল করে অন্তঃপুরের দরজা বন্ধ করা হতো। সাত বছর বয়েস থেকে বিয়ে শুরু হতো। মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও বিয়ে হচ্ছে। খাবি খেতে খেতে মন্ত্র বলছে। স্যালাইন চলছে। খাট এসে গেছে। হরিনাম হচ্ছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছেন, বলো, ওঁ প্রজাপতি ঋষি। মৃত্যুপথযাত্রী বর। নব্বই বছর বয়েস। হাপরের মতো শ্বাস টানছে—ওরে বাবারে ওঁ। প্রজাপতি ঋষির নিকুচি করেচে রে বাপ। কবিরাজ মশাই নাড়ি ধরে বসে আছেন। বলছেন, আর সময় নেই। কোনও রকমে সম্প্রদানটা সেরে দ্যান। কন্যাটি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে। কে বলছে, ওরে! কাঁদিস না, কাঁদিস না। শুভ কাজে কাঁদতে নাই। আর একজন বলছে, কাঁদো, কাঁদো, আর এক মিনিট পরেই তো বেধবা হবে। পুরোহিত বরকে বলছেন, কোনওরকমে সিঁদুরটা ঠেকিয়ে দাও। ওরে হাতটা ধরে তুলে দে না সিঁথিতে। ব্যস! বিধবা! সিঁদুর মুছে দে। শাঁখা ভেঙে দে। নোয়া খুলে দে। থান পরিয়ে দে। শাঁখ আর উলু বন্ধ। কান্না। বলো হরি, বলো হরি। এইবার বউরা সব মিছিল করে শ্মশানে চলল। সতী হবে। বিয়ের ভোজনেই বলে দেওয়া হল শ্রাদ্ধের ভোজন কবে হবে। জামাইয়ের বয়েস নব্বই শ্বশুরের বয়েস পঁচিশ।'

মেজ মিত্তির বললে, 'সে একটা যুগ গেছে বটে। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কুলীন ছিলেন। গল্প শুনেছি, তিনি তাঁর অনেক স্ত্রীকে চিনতেন না। আমার আদর্শ—তুলসীদাস। বেহা বেহা সবকোই কহে, মেরা মনমে এহি ভায়। চড় খাটোলি ধো ধো লগড়া জেহেল পর লে যায়। ওই দেখো বর যাচ্ছে চৌদোলায় চড়ে। বাদ্য বাজনা। যাচ্ছে কোথায়? না জেলখানায়।'

'তোর মধ্যে প্রেম নেই। ওরে শোন্, রবীন্দ্রনাথ আমার গুরু। বিয়ে তোকে এই ধেড়ে বয়েসে আর করতে হবে না, কিন্তু ভালোবাসাটা যেন থাকে। এই গানটা শোন্।' বড় মিত্তির গাইছে :

'ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি।।'

গান্ধারী আবার এসেছে। গান তাকে ভীষণ টানে। হাতে একটা সসপ্যান। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বড় মিত্তির গাইছে,

'সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে
সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভেলা দিনের কাঁদন-হাসি।।'

গান্ধারী কুসির পায়ের কাছে কখন এসে বসেছিল। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে।

পিঠে হাত রেখে কুসি জিজ্ঞেস করলে, 'কাঁদছিস কেন? এই আনন্দের দিনে।'

ধরা গলায় বললে, 'মা! মায়ের কথা মনে পড়ছে। মা রেলে কাটা পড়েছিল। টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। মা যে আমায় ভীষণ ভালোবাসত।'

কুসি চেয়ারে বসে আছে। গান্ধারীর মাথাটা তার কোলে।

বড় মিত্তির বললে, 'বন্ধুগণ! বাবাই বলো আর মা-ই বলো, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী পুত্র, পরিবার—আসল কথা হল, ভালোবাসা, প্রেম। গান্ধারী! মোছো, মোছো আঁখিজল। আমার বোন কুসির কাছে, মাতৃসমা ভগিনীর কাছে একটি প্রশ্ন আছে।'

কুসি : মাতৃসমা বললে কেন?

বড় : শোনোনি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃসম। এই যে আমি, আমি তোমাদের সকলের পিতার মতো—ফাদার ফিগার। তোমরা সবাই দেখো, সন্তানসম মেজ—পিতাসম বড়র বাড়িতে পরার চটিজোড়া পরে কেমন সগর্বে দণ্ডায়মান।

মেজ : বৃদ্ধ পিতা বিস্মৃতি রোগে আক্রান্ত। এই ক'দিন আগে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বনবাসী রামচন্দ্রের ভূমিকা অভ্যাস করছিলেন। আমাকে ডাকলেন, ভরত এদিকে এস। নগ্নপদে ঘুরিতেছ কেন, এই লহো মোর পাদুকা।

বড় : ভরত সেই পাদুকা নিত্য পুজো করত। তোমার মতো উদ্ধত ভঙ্গিতে পায়ে পরে ফটাস ফটাস করে ঘুরত না।

মেজ : পুজোর কাপড় পড়ে লোকে যেমন পুজো করে, আমি সেইরকম পাদুকা পরে তোমার পুজো করি।

বড়: সন্তুষ্ট হইলাম। এখন কুসিকে প্রশ্ন, 'তুই কেন বিয়ে করলি না, সুন্দরী?'

কুসি : তোমাদের ছেড়ে থাকা যায় না বলে। এই দু'টো কচি পাঁঠাকে কোথায় রেখে যাব। কার কাছে রেখে যাব। গা মাখা ঝোল করে খেয়ে ফেলবে।

বড় : এই দেখ্ মেজ, একই রকমের ত্যাগ। মনে আছে অনেক কাল আগে, বাবা যখন হঠাৎ মারা গেলেন, শ্মশানে চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, ভাই দু'টো নাবালক, বোনটার বিয়ে দিতে হবে, আমরা বিয়ে করব না। কী জানি বাবা, কেমন বউ আসবে, কৈকেয়ী আর মন্থরা আমাদের সুখের সংসার ফ্র্যাকচার করে দেবে।

মেজ : কুসির শাসনে আমরা কেমন সুখে আছি বলো ?

বড় : মাঝে মাঝে মনে হয় স্বর্গে আছি। উঃ পাগল করা গন্ধ আসছে রান্নাঘর থেকে। একটু টেস্ট করা না। টক, ঝাল, নুন।

মেজ : কুসি। ন বউকে জন্মদিনে কী দেওয়া যায় বল্ তো। মাদুলি তো ক্যানসেল।

কুসি : একটা বাথরুম দাও।

বড় : এই রাতে বাথরুম কোথা থেকে কিনব? বাথরুম কী জিনিস?

কুসি : আরে, বাথরুম জান না। যেখানে মানুষ চান করে।

বড় : সে তো আমাদের আছে।

কুসি : ওর নিউ স্টাইলের একটা বাথরুমের খুব সখ। সিরামিক টাইলস্, টেলিফোন শাওয়ার, বাথটাব, টাওয়ার ট্যাপ।

মেজ : ওই ইংরেজি সিনেমার মতো।

বড় : বাথ টাব? আমি শুয়ে থাকব সাবানের ফেনায়। সেলুলার ফোনে কথা বলব ভগবানের সঙ্গে।

দুদ্দাড় করে ঘরের মাঝখানে দরজা-ফরজা ভেঙে ঢুকে এল একটি ছেলে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। উস্কোখুস্কো চুল। বড় বড় দু'টো চোখ লাল টকটকে। মারবে না কি। ডাক্তার আর অধ্যাপক পেটানোর যুগ এসেছে।

যুবক : ডাক্তারবাবু, আবার হেঁচকি উঠছে। ননস্টপ। হিক্ হিক্। কোনও কাজ হল না ওষুধে।

বড় : কার হেঁচকি? কিসের হেঁচকি?

যুবক : আমার স্ত্রীর।

বড় : কী খাইয়েছিলি?

যুবক : এক খিলি জর্দা পান।

বড় : জর্দার অভ্যাস ছিল?

যুবক : না। জীবনের এই ফার্স্ট জর্দা।

বড় : মানুষ হেঁচকি তুলেই মরে। সেই হেঁচকি তোলার বয়েস এখনও হয়নি। এটা ছেঁচকি।

কুসি, গান্ধারী দু'জনেই উঠে চলে গেছে ভিতরে। স্বাভাবিক। বসে থাকলে চলবে। উৎসবের বাড়ি। কত কাজ। রান্নাঘরে একসঙ্গে তিনটে গ্যাস জ্বলছে।

যুবক : বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমি জোর করে জর্দা খাওয়াইনি। নিজের ইচ্ছেয় চেয়ে চেয়ে খেয়েছে। এ যা দিনকাল যদি মরে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমার গণধোলাই, আমার মায়ের, আমার বোনের হাজতবাস। সতীর চিতায় পতির সহমরণ।

বড় : সেরকম কোনও সম্ভাবনা আছে।

যুবক : নেই কেমন করে বলি। হলেই হল। একালে সবই সম্ভব। আমার আর একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম ছিল।

বড় : দয়া করে তাকে বিয়ে করলেই হতো।

যুবক : একটু সমস্যা ছিল। সেই মেয়েটা আর একটা ছেলেকে ভালোবাসত, সেই ছেলেটা আবার আর একটা মেয়েকে ভালোবাসত, সেই মেয়েটা আবার আর একটা.....।

বড় : হয়েছে, হয়েছে সব শেষে একটা ফাঁকা মাঠ, মাঠে একটা গরু। ইলু, ইলু, ইলু, ইলু।

যুবক : আপনার কাছে এসেছিলুম, প্রয়োজন হলে বলবেন তো!

বড় : কাকে বলব?

যুবক : পুলিশকে, আদালতকে। ডেথ সার্টিফিকেটে লিখে দেবেন, হেভি ডোজে জর্দা খেয়ে মৃত্যু।

বড় : (মেজকে) কী সব আবোল-তাবোল বকছে বলো তো।

মেজ : দাঁড়াও, কুসিকে কল করি। (গলা চড়িয়ে) কুসি কুসি।

কুসি : আজ বাড়িতে একটা উৎসব বারে বারে ডাকলে হয়!

বড় : কী করব বলো। এ কোথা থেকে এসে কী সব বকছে?

কুসি—কোথা থেকে আসবে কেন, নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাই এসেছে। পল্লবকে চিনতে পারলে না। যাত্রা পালা লিখে বিখ্যাত।

বড়, মেজ সমস্বরে : আমাদের দেশের গৌরব পল্লব গাঙ্গুলি। মাই গড!

বড় : যাত্রা আমার ভালোই লাগে। ছেলেবেলায় খুব দেখেছি। এখন আর সময় পাই না।

মেজ : যাত্রার চেয়ে যাত্রার নাম আমার ভীষণ ভালো লাগে। 'সতীর কোলে পতির মাথা।'

পল্লব : ওটা আমার হিট পালা।

মেজ : জুতোর তলায় কাঁটা পেরেক।

পল্লব : ওটা আমার নয়। আমার আর-একটা হিট পালা হল, 'পানাপুকুরে কচি সুন্দরী।' আমি এখন যে পালাটা লিখছি, সেটার নাম 'জর্দাপান কেন খেলে কুলবধূ'। ক্রাইম পালা। সেখানে এইরকম একটা প্লট আছে। একের পর এক বধূর করুণ মৃত্যু। শেষে সাহসী এক বধূ আসামিকে ধরবে। তাকে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবে। তারপর সে ইলেকশানে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী হবে। আইন করবে, ক্যারেকটার সার্টিফিকেট না দেখালে কোনও মেয়ে কোনও ছেলেকে বিয়ে করবে না। আমার পরের পালা, 'ঘরে ঘরে সিঁদুরের আগুন।'

চাপা কাশি! ঠিক কাশি নয়, একটা বনেদি শব্দ। সেকালের সর্বনাশা জমিদারদের গলা দিয়ে এই রকম শব্দ বেরোবার পরই কারও না কারও সর্বনাশ হতো। এক বৃদ্ধের প্রবেশ।

বৃদ্ধ : চিনতে পারছ মিত্তির?

বড় : আমাকে বলছেন?

বৃদ্ধ : তোমাদের দু'জনকেই।

মেজ : চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধ : কালীপুজোর রাতে আমার খড়ের গোলা তোমাদের বাজির আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

বড় : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো অনেক বছর আগে। আমরা তখন ছাত্র।

বৃদ্ধ : সেই আগুন আজও আমার বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছে।

বড় : এখনও জ্বলছে। নেভাতে পারছেন না!

বৃদ্ধ : তোমাদের জন্যে আমি ধনেপ্রাণে মারা গেছি। ত্রিভুবনে আমার আর কেউ নেই। একজনের আশ্রয়ে ছিলুম, সে এই মাত্র আমাকে তাড়িয়ে দিলে।

মেজ : তাড়ালে কেন?

বৃদ্ধ : আগুনে আমার খুব ভয়। সেই থেকে। লোকটা সংসারে আগুন ধরাচ্ছে। প্রতিবাদ করেছিলুম, বললে, নিকাল যাও। বেরিয়ে এলুম। এইবার কোথায় যাই। জানো মিত্তির, মানুষের কোনও যাওয়ার জায়গা নেই। যার ঘর আছে তার আছে। যার নেই? হ্যাঁগো, তোমরা কী আমাকে তাড়িয়ে দেবে? তা দেবে নাই বা কেন। এই বাজারে কে কাকে দেখে!

কথা শেষ হতে না হতেই পরিবারের সব সদস্য হইহই করে ঘরে ঢুকল। আনন্দের জোয়ার এল। কুসির হাতে বার্থডে কেক। মিত্তিরদের বাড়িতে সবই তৈরি হয়। কেকটার মাথায় ছোট্ট একটা হনুমান বসে আছে। চকোলেট দিয়ে

তৈরি। বৃদ্ধ মানুষটি অবাক হয়ে দেখছেন আর বলছেন, 'আজ কিছু আছে বুঝি? তাহলে আমি যাই। রাতটা শ্মশানেই কাটাই।' বৃদ্ধ উঠছেন।

বড় : দাঁড়ান। যাচ্ছেন কোথায়? আমরা কী যেতে বলেছি। কুসি, চিনতে পারছিস এঁকে। না পারারই কথা, তুই তখন ছোট। ইনি আমাদের সরকার মশাই। এক সময় খুব ভালো টপ্পা গাইতেন।

কুসি : হাত জোড়া, নমস্কার করতে পারছি না।

বড় : আজ থেকে আমাদের বাড়িতে থাকলে কোনও আপত্তি আছে তোমাদের?

বাচ্চা দুটো : (আনন্দে) আমাদের দাদু, আমাদের দাদু।

এই প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যেই ঘরে এসে দাঁড়াল এক বিচিত্র চরিত্র। জিনসের প্যান্ট, টকটকে লাল রঙের টি শার্ট। হাতে একতারা। সে গান গাইতে গাইতে ঢুকছে।

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/তাই হেরি তায় সকল খানে..'

ঠিক সময়ে এসে পড়েছি দাদা, জাস্ট ইন টাইম।'

একালের বিখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল বাউল। চেতন বাউল। ন-মিত্তিরের বন্ধু। গান্ধারী বললে, 'আজ কিন্তু সব নিরামিষ ভাই।'

চেতন : আমি কি কেবল খেতে আসি? আমি গান শোনাতে আসি।

গান্ধারী : তুমি বাপু বড্ড খাও।

চেতন : কী আশ্চর্য কথা! খিদে পায় তাই খাই। দোষটা তো কুসিদির। অত ভালো রাঁধে কেন?

ইতিমধ্যে টেবিলের উপর কেক সাজানো হয়েছে। বাতি জ্বালা হয়েছে।

কুসি ঃ সবাই রেডি!

মেজ মিত্তির গালে বার কয়েক হাত বুলিয়ে বললে, 'য়্যাঃ আজ দাড়ি কামানো হয়নি যে।'

বড় বললে, 'আজ রেখার জন্মদিন। তোর নয়। আজ রবিবার। মানুষ যেমন কাজে বেরোয় না, দাড়িও সেইরকম বেরোয় না।'

মেজ বললে, 'ঠিক বলেছ। গালটা সত্যিই তেমন খড়খড় করছে না।'

কুসি : সব চুপ! আমাদের দীপু আর পূজা ছোট্ট একটা নাটিকা পরিবেশন করবে। তোমরা সবাই বোসো। মেজদা ছুরিটা কেক কাটার জন্যে এনেছি, হাত কাটার জন্যে নয়।

বড় মিত্তির বললে, 'মেজ! তোর স্কুল হ্যাবিটটা আর গেল না। ছুরিটা রাখ্।'

কুসি : বড়দা, লাইটারটা বাতি জ্বালানোর জন্যে এনেছি। ওটা তোমার খেলনা নয়। তখন থেকে দেখছি এক নাগাড়ে খ্যাচাং খ্যাচাং করছ।

মেজ : রেখে দে। রেখে দে। ওদের জিনিস রেখে দে। আমি তোকে একটা 'ডামি লাইটার' কিনে দোবো।

চেতন বললে, 'কুসিদি। আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দোবো। একতারায়।'

কুসি খুশি হয়ে বললে, 'দাও না। সাইলেনস! স্টার্ট!'

শুরু হল নাটিকা।

পূজা। হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বলছিলি লাল?
আর সেদিন নাকি রাত্রি জুড়ে নাক ডেকেছিস বিশ্রী সুরে?
আর তোদের পোষা বেড়ালগুলো শুনছি নাকি বেজায় হুলো?
আর এই যে শুনি তোদের বাড়ি কেউ নাকি রাখে না দাড়ি?
দীপু। ক্যান্ রে বাটা ইস্টুপিড্? ঠেঙিয়ে তোকে করব টিট।
পূজা। চোপরাও তুম স্পিকটি নট, মারব রগে পটাপট—
ফের যদি ট্যারাবি চোখ কিম্বা আবার করবি রোখ
কিম্বা যদি অমনি করে মিথ্যেমিথ্যি চ্যাঁচাস জোরে
আই ডোন্ট কেয়ার কানাকড়ি, জানিস আমি স্যান্ডো করি?
ফের লাফাচ্ছিস? অল রাইট কামেন্ ফাইট। কামেন্ ফাইট।
দীপু। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি টেরটা পাবে আজ এখনি
আজকে যদি থাকত মামা পিটিয়ে তোমায় করত ঝামা
আরে! আরে! মারবি নাকি? দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি!
হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ। রাগ কোরো না করতে চাও কি তাই বলো না?
পূজা। হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো সত্যি বটেই, আমি তো চটিনি মোটেই মিথ্যে
কেন লড়তে যাবি? ভেরি ভেরি সরি, মসলা খাবি?
দীপু। শেক হ্যান্ড আর দাদা বল সব শোধ বোধ ঘরে চল!
ডোন্ট পরোয়া অল্ রাইট্ হাউ ডুয়ুডু। গুড নাইট।

বড় বললে, 'হাততালি, হাততালি। আর ধৈর্য রাখা যাচ্ছে না। এইবার কেকে মারো ছুরি।'

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

চেতন এইটাকেই গানে ঘুরিয়ে দিল, 'ওরে! সেই হ্যাপি রে এই দুনিয়ায় যার আছে মানি। ফানি, ফানি, মানি মানি, মানি। ভাই! মানিতেই মানী।'

দ্বিতীয় দিন

আবার ঢুকে পড়েছি মিত্তির পরিবারের আনন্দ নিকেতনে। দাবার ছক পড়েছে। বড় মিত্তির আর মেজ মিত্তির মুখোমুখি। আজ রবিবার। পয়লা

আশ্বিন। পুজো এসে গেল। আকাশের নীল আনন্দে সূর্যদেব যেন সোনার দোকান খুলেছেন।

শরতের কী শোভা!

দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবির মুখেও হাসি। নীরব আশীর্বাদ ঝরছে। সৎ থাকো। আনন্দে থাকো। সকলকে আনন্দে রাখো। দু'জনেরই পাশে ছোট ছোট দুটো টি-টেবল। ইতিমধ্যেই দু'জনের দু'কাপ করে চা খাওয়া হয়ে গেছে। অশান্তিও শুরু হয়েছে যথারীতি।

মেজ় বলছে, 'বড়দা! কিছু একটা কেরামতি করেছ মনে হচ্ছে। তোমার এই বোড়েটা তো এখানে ছিল না ভাই। কোথা থেকে এল?'

বড় : মিথ্যে কথা বলবি না মেজ। জীবন আর খেলা দু'টোতেই সত্যকে ধরে থাকবি। অনেস্টি, ক্যারেকটার। আমাদের মাতামহ বলতেন, জেলে যেতে হয় সে ভি আচ্ছা। লেকিন সত্য নেহি ছোড়ুঙ্গা।

মেজ : হাতটা ওদিকে সরছে কেন?

বড় : এ কী রে। হাতের একটা ফ্রিডম থাকবে না?

মেজ : শোনো বড়দা, এই দাবার ব্যাপারে তোমার একটা ব্যাড রেপুটেশন আছে। তোমার সঙ্গে যে খেলতে বসে সেই হারে। তুমি যদি দাবায় এত বড় চ্যাম্পিয়ন হবে তাহলে কারপভকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছ না কেন? তোমার যত কেরামতি বাড়িতে আর সে কেরামতিটা হল জোচ্চুরি। কুসি আমায় আগেই সাবধান করেছিল। মেজদা চোখ বুজিয়ে থেকো না, চোখ খোলা রেখো। আমি ওই উপদেশটাকেই একটু অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিলাম। চোখ বুজিয়ে মিট মিট করে দেখছিলাম তুমি কী কর। তুমি এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে ওটা ঠেলে দিলে।

বড় : তুমি স্বপ্ন দেখছিলে মানিক। ওই ঘুঁটিটা প্রথম থেকেই ওখানে আছে।

মেজ : না, ওটা ছিল না।

বড় : দাদাকে জোচ্চোর বলতে তোর লজ্জা করছে না। তোর অন্তরে লাগছে না।

মেজ : জোচ্চোরকে, জোচ্চোর বলব অন্তরে লাগবে কেন?

বড় : তার মানে আমি একটা চিট।

মেজ : আমি ইংরেজি বলিনি। জোচ্চোর আর চিট দু'টো আলাদা ব্যাপার। আকাশ-পাতাল তফাত। চিট অনেক বড় ব্যাপার। সে তোমার দ্বারা হওয়া সম্ভব হবে না। তুমি ছিঁচকে চোর হতে পারবে, ডাকাত কোনও দিনই নয়।

বড় : ছিঁচকে চোর কথাটা কি খুব সম্মানজনক হল ভাই? ছিঁচকে চোর,

সিঁদেল চোর, এ-সব কথা কারোকে বলবে না। এমনকী নিজের ভাইকেও না। তবে হ্যাঁ, ডাকাত বলতে পার। ডাকাত উপাধি খুব রেসপেকটেবল। ভালো ভালো ছেলেরা ডাকাত হয়ে বুড়ো বুড়ো মন্ত্রীদের সামলাচ্ছে।

মেজ : ঘুঁটিটা ওখান থেকে সরাও।

বড় : কেন সরাব, সরাব কেন?

মেজ : ওটা ওখানে ছিল না।

বড় : আলবাত ছিল।

মেজ : আলবাত ছিল না।

বড় : ছিল, ছিল, ছিল।

মেজ : না, না, নাআঃ।

বড় : কামড়ে দিবি না কি? কুসিকে ডাকি।

মেজ : কুসিকে ডেকে কী হবে? চোরকে সাধু করে দেবে?

বড় : আজ্ঞে না, সাধুকে চোর করে দেবে।

মেজ : তা বটে। আজকাল চোররা মাতব্বরের মদতে সাধু হচ্ছে। আর অসহায় সাধুরা মিথ্যে অপবাদে জেল খাটছে।

বড় : দাঁড়া, দাঁড়া, কুসিকে ডাকি, তারপর দেখবি তোর কী হয়। কুসি, কুসি।

কুসি খুন্তি হাতে ঘরে ঢুকল। রবিবার রান্নার নানা তরিবাদি হয়, গান্ধারী একা পারে না।

কুসি : তোমাদের জ্বালায় বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। তোমরা বিয়ে করো বাপু, বেঁচে যাই।

বড় : সে পরে দেখা যাবে। আগে তুই বল আমাকে তুই চোর বলেছিস। ছিঁচকে চোর। আমি নাকি ফ্রিজ খুলে চুরি করে মিষ্টি খাই। ছেলেবেলায় আমার জন্য মা আচারের বয়াম সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখত? শেষ জীবনে আমি ডাকাতি করব? আমি ব্যাগ দেখলেই খুলে টাকা সরাই। সেজ বউয়ের কানের দুল বিক্রি করে আমি বাদাম ভাজা খেয়েছি।

মেজ : দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি এসব কী বলছ?

বড় : আরে দাঁড়া, দাঁড়া কুসির নাম করে তুই যা বলেছিস, তারপর এইগুলোই আসে। একটা রোগের পিছন পিছন দশটা রোগ জোটে।

কুসি : কী হয়েছে, বলবে তো?

মেজ : আরে সেই ওল্ড কেস। খেলতে খেলতে অন্যমনস্ক হয়েছি অমনি ঘুঁটি সরিয়েছে।

কুসি : বড়দা, এই রোগটা তোমার আছে। তুমি যখনই আমার সঙ্গে লুডো

খেলতে বসেছ তখনই আমি গোহারান হেরেছি। তুমি পাঁচ ফেলে ছয়ের চাল দাও। আঙুলের কায়দায় ছক্কা ফেল। এ তোমার অনেকদিনের ব্যামো। তোমার ভিতর স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই। তুমি হারতে ভয় পাও। খালি হারাতে চাও।

বড় : তার মানে আমি ক্যারেকটারলেস। আমি একটা বদ লোক। তাহলে কাল থেকে তোরা আমাকে দাদা বলিস না।

মেজ : তুমি হচ্ছো ক্রুকেড লোক তো।

বড় : ক্রুকেড মানে?

মেজ : বাঁকা লোক।

বড় : আর তুমি ভারি সোজা লোক।

কুসি ক্ষেপে গিয়ে একটানে দাবার ছকটক সব উল্টে দিল, তোমরা যদি আর কোনও দিন দাবা খেলতে বসেছ, তাহলে এই খুন্তি গরম করে ছ্যাঁকা দোবো।

বড় : তা তুমি দিতে পার। বড় ভাইকে যখন চোর বলতে পার, তখন ছ্যাঁকাও দিতে পার।

কুসি : তোমার এখন এক কাপ চা খাওয়া দরকার।

বড় : থাক, থাক, অত খাতিরে প্রয়োজন নেই। পয়সা ফেলব মোড়ের দোকান থেকে খাব।

কুসি : তোমার অনেক পয়সা আছে। সে আমরা জানি। তবে আমার হাতের চায়ের মতো চা কোথাও পাবে না।

বড় : কোন্ হাত? যে হাত খুন্তি ছ্যাঁকা দেয়। আমি জানি, যেদিন আমার মা মারা গেছেন, সেইদিন থেকে আমার আদরও চলে গেছে। আর এই মেজ জ্ঞানের অহংকারে একেবারে ফেটে পড়ছে। অধ্যাপক, অধ্যাপক।

মেজ : বড়দা! তুমি তিলকে তাল করছ।

বড় : আজ্ঞে না। আমি তালকে তিল করার চেষ্টা করছি। তোমরা যা বলেছ, অন্য কেউ হলে গৃহত্যাগ করত।

মেজ : শোনো বড়দা, এই গৃহত্যাগের কথা যখন বললে তখন আমার স্ট্যাটিসটিক্সের কথা শোনো। আমি জনে জনে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি গৃহত্যাগ করে কে কতদূর যেতে পেরেছে। ওই গেট পর্যন্ত, কিংবা গেটের বাইরে রাস্তা পর্যন্ত। একজনই বেশি দূর পর্যন্ত গিয়েছিল ওই মোড়ের মাথার ল্যাম্পপোস্ট পর্যন্ত। রাত এগারোটার সময় পান-বিড়ির দোকান বন্ধ করতে করতে দোকানদার বলল, আমি তো চললাম, আপনি কী করবেন? সে তখন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, ভাই বাড়িতে একটু বলে পাঠাও না আমি এখানে দাঁড়িয়ে

আছি, একবার ডাকলেই যেতে পারি। অতএব গৃহত্যাগ করার আগে ভেবে নাও কোথায় যাবে, কার কাছে।

বড় : আমার যাবার অনেক জায়গা আছে।

কুসি : ঠিক আছে। জায়গাগুলো বলো।

বড় : যেমন ধরো, যেমন ধরো, যেমন ধরো (হতাশ হয়ে) যাবার কোথাও জায়গা নেই রে। এক কাপ চা-ই খাওয়া।

মেজ : পথে এসো। শোনো বড়দা, আমরা যে গোয়ালে আছি সেই গোয়ালেই মিলেমিশে থাকতে হবে। তুমি হলে বড় ষাঁড়, আমি হলুম মেজ ষাঁড়, ভাইগুলো সব ষণ্ড, আর .....

কুসি—আর এগিও না মেজদা। মেয়েদের দিকে যেও না।

হঠাৎ সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—আসতে পারি? সেই প্রবীণ মানুষটি। দরজার কাছে। কুসির খুব আনন্দ। আমাদের প্রমোদ জ্যাঠা। প্রমোদ জ্যাঠা কতদিন পরে এলেন? বাব্বা, ভুলেই গেছেন।

প্রমোদবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা জান পাড়ায় আমার নাম হয়েছে, মিস্টার অ্যাংজাইটি। কিন্তু তোমরাই বলো, দুশ্চিন্তা না করে থাকা যায়। যুগটার নামই তো এজ অফ অ্যাংজাইটি। বসতে পারি?

বড় : অবশ্যই অবশ্যই। জন্ডিস হয়েছিল, কেমন আছেন?

প্রমোদ : অ্যায়। ভালো কথাই জিজ্ঞেস করেছ। জন্ডিসে কী হয় ডাক্তার তুমি জান।

কুসি : আপনি চা খাবেন তো?

প্রমোদ : অবশ্যই।

বড় : তার মানে, লিভার ফাংশান পিকআপ করেছে।

প্রমোদ : এই দ্যাকো! ডাক্তার হয়ে কী কথাটাই বললে। চায়ের সঙ্গে লিভারের কী সম্পর্ক। গলায় চা ঢালবে। সড়াক করে স্টম্যাকে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে জলীয় পদার্থ নিজস্ব চ্যানেলে চলে যাবে টয়লেটে। আর চায়ের কষটা লেগে যাবে পাকস্থলীর ভিতরের দেয়ালে। তা হলে; কী হল? চায়ের সঙ্গে সম্পর্ক আলসারের। লিভারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তবে জন্ডিসের সঙ্গে লিভারের সম্পর্ক আছে।

বড় : জল ফুটিয়ে খাচ্ছেন।

প্রমোদ : জল ফুটিয়ে আমার জন্য এত তদ্বির কে করবে? তোমাদের জীবনের দাম আছে। আমার জীবনের কী দাম?

মেজ : আপনি একসময় কত ভালো বেহালা বাজাতেন।

প্রমোদ : একালে বেহালা বাজালে লোকে মারতে আসে। বেহালা নাকি শুধু কাঁদাতে জানে। কথাটা খুব মিথ্যে নয়। যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমায় কান্নার সিন হলেই বেহালা বেজে ওঠে।

মেজ : বেহালায় আপনি ক্লাসিক্যাল সুরটুর বাজাতে পারেন। সময়টা ভালো কাটবে। বিদেশি কনসার্টে একসঙ্গে পঞ্চাশটা বেহালা বাজে।

প্রমোদ : বিদেশের সঙ্গে কেন তুলনা করছ। তোমরা শুনেছ?

বড় : কী হল আবার?

প্রমোদ : কিডন্যাপিং। এ পাড়ায় ঢুকে পড়েছে। সকাল থেকে সুজনের মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বউমাদের ডাকো।

বৌমা, বৌমা।

পরমা আর রেখা, দুই বউ। ঘরে ঢুকল। বনেদি বাড়ির বউ। প্রায় একই রকম দেখতে।

মনে হয়, দুই বোন। মিশুকে। হাসি খুশি। দু'জনেই একসঙ্গে বললে, কী বলছেন জ্যাঠামশাই?

প্রমোদ : তোমাদের সাবধান করতে এলুম। বাচ্চা দু'টোকে সাবধানে রেখো, চোখে চোখে। সুজনের বাচ্চা মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। এই বার চিঠি আসবে দশ লাখ টাকা ছাড়ো।

রেখা : থানায় ডায়েরি করেছে?

প্রমোদ : আর ডায়েরি! পুলিশ কী করবে? সে কি আর এদেশে আছে?

পরমা : কত পুলিশ। এক-একটা থানায় গিজগিজ করছে পুলিশ। পুলিশ নেই?

প্রমোদ : আমি পুলিশের কথা বলিনি। আমি মেয়েটার কথা বলছি। সে এতক্ষণ পাঞ্জাব কি হরিয়ানায় পাচার হয়ে গেছে। দুবাইতেও চলে যেতে পারে।

রেখা : এইটুকু সময়ের মধ্যে দুবাই চলে যাবে?

প্রমোদ : মর্ডান টেকনোলজির যুগে মানুষের স্পিড কি সাংঘাতিক বেড়েছে! হু হু শব্দে সব ছুটছে। হ্যাঁ এই স্পিডের কথায় মনে পড়ল, ডাক্তার! তুমি কি রোজ ওই স্পিডেই গাড়ি চালাও?

বড় : কোন্ স্পিডে?

প্রমোদ : ওই যে আজ হুস্ করে চলে গেলে আমার পাশ দিয়ে। তুমি জান, কী হারে দুর্ঘটনা হচ্ছে। কালকে আমার চোখের সামনে একটা গাড়ি একটা অটোকে মারল। অটোটা ছিটকে রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে। বসে বসে তিনজন খবরের কাগজ পড়ছিল। তাদের ঘাড়ে। বাস্। এক স্ট্রোকে ছ-জন খতম।

বড় : ছ-জন কোথা থেকে এল?

প্রমোদ : আরে তিনজন তো অটোর ভিতরে ছিল।

মেজ : ছ-জনেই কোথা থেকে এল?

প্রমোদ : আরে তিনজন তো অটোর ভিতরে ছিল।

মেজ : ছ-জনেই মারা গেল?

প্রমোদ : সঙ্গে সঙ্গে কী গেল। যখন মেরেছে তখন ছ-টাই যাবে। জীবনের কোনও দাম নেই, কোনও দাম নেই। চারপাশে ফুটকড়াই-এর মতো লোক। পিলপিল করছে গাড়ি। যাবে কোথায়। এইভাবেই পপুলেশন কন্ট্রোল হচ্ছে।

গান্ধারী চা নিয়ে ঢুকল। আজ খুব সেজেছে। রবিবারের সাজ।

গান্ধারী : এই নিন, গরম গরম দার্জিলিং চা।

প্রমোদ : এই শোনো, তুমি আজ সেফটিপিন দিয়ে দাঁত খুঁটছিলে?

গান্ধারী : কখন?

প্রমোদ : যদি না খুঁটে থাক ভালো। আর যদি ওই অভ্যাস থাকে তাহলে ছাড়ো। আজ আমাদের পাশের বাড়ির কার্তিকের মা হাসপাতালে গেল। দাঁতের গোড়ায় সেফটিপিন দিয়ে খোঁচা মেরেছিল। সেপটিক।

গান্ধারী : তাই বলুন, আমি তো ভয় পেয়ে গেছি।

প্রমোদ : (মেজকে) শোনো শোনো চা সবসময় ঠান্ডা করে খাবে। অত গরম চা খেলে পেটের লাইনিং নষ্ট হয়ে যায়।

বড় : তা আপনার শরীর এখন কেমন যাচ্ছে।

প্রমোদ : আর শরীর। ক্যানসার কেমন হচ্ছে দেখেছ ডাক্তার। ঘরে ঘরে ক্যানসার। জান আমার খুব অম্বল হয়। আজকাল শুনছি ডাক্তাররা অম্বলের কারণ খুঁজে পায় না। খালি অ্যান্টাসিড খাওয়ায়। একবারও ভাবে না ওটা ক্যানসার হতে পারে। এই যে আমার থেকে থেকে কাশি হয় এই কাশিটা কী সেই কাশি?

মেজ : কোন্ কাশি? বারাণসী?

প্রমোদ : খুব অফেনডেড হলুম। আমি একজন বয়স্ক লোক। তোমাদের কাছে আমি পাঁচটা কথা বলতে আসি। তুমি ঠাট্টা করছ?

বড় : না, না, আমিও তো বুঝতে পারলাম না। কাশি তো কাশিই হবে।

প্রমোদ : শোনো, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সব কাশি কাশি নয়। কিছু কাশি হল লাং ক্যানসার। তোমরা কী বলতে পার, তোমাদের কারুর ক্যানসার হয়নি বা হবে না?

বড় : তা কী করে বলব? হতেই পারে।

প্রমোদ : তাহলে ক্যানসার নিয়ে ঠাট্টা কেন?

বড় : কই ঠাট্টা করিনি তো।

প্রমোদ : ঠাট্টা না করলেই ভালো। ও হ্যাঁ ভুলে যাবার আগে জিজ্ঞাসা করেনি, আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমশই কমছে। একটা ব্রেন স্ক্যান করানো কী দরকার?

বড়ো : স্ক্যান, স্ক্যান করাতে যাবেন কেন?

প্রমোদ : আরে শোনো, আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের বউয়ের এইরকম পাওয়ার ঘন ঘন চেঞ্জ হচ্ছে। শেষে ধরা পড়ল ব্রেন টিউমার। টিউমারটি তখন বিশাল হয়ে গেছে। এখন ডাক্তাররা বলছেন কিস্যু করার নেই।

বড় : আপনার দৃষ্টিশক্তি কমছে বয়েসের জন্য। একে বলে চালসে।

প্রমোদ : কী কথাই বললে, আমার ফ্যামিলিতে কারুর কখনোই চালসে হয়নি। আমার বাবা আশি বছর বয়েসে খালি চোখে পাখি ছুঁচে সুতো পরাতেন।

বড় : তাহলে স্ক্যান করান। খরচটা কত জানেন তো?

প্রমোদ : সে করাতেই হবে। আমার বাবা একটা কথা বলতেন, এ স্টিচ ইন টাইম সেভ্‌স্ নাইন। বাঃ চা-টা বেশ ভালো হয়েছে তো। কত টাকার?

বড় : কে জানে, কুসি আনায়।

প্রমোদ : (একটু বাঁকা হেসে) তোমরা সংসারের কিছুই দেখ না, ওই মেয়েটার ঘাড়ে ফেলে রেখেছ। আছে অনেক তাই বুঝতে পারছ না। যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি। পরের লাইন ?

মেজ : ও কুসি জানে।

প্রমোদ : সবই তোমাদের কুসি। মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছ না কেন?

মেজ : ও বিয়ে করবে না।

প্রমোদ : আমার মাসিমাও বিয়ে করেননি। শেষ কালটায় মাথার গোলমাল হয়ে গেল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলেই সপাটে ঝাপটা মারবে। মারবেই মারবে। (সুর করে) এই যে এত ইউটেরাসে ক্যানসার হচ্ছে কেন হচ্ছে। একটা রিপোর্টে পড়ছিলুম....।'

বড় : অসুখের কথা থাক না জ্যাঠামশাই। ওতে মন দুর্বল হয়ে যায়।

প্রমোদ : বাজে কথা, পুরনো কথা। জেনে রাখ প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। আচ্ছা। তোমরা কী জুতো পর?

বড় : জুতোয় চলে গেলেন?

প্রমোদ : কেন গেলুম জান। মুখ খোলা জুতো হলে ভয় নেই। শু হলেই বিপদ।

মেজ : বিপদ কেন? কড়া পড়বে পায়ে?

প্রমোদ : কড়াতে মানুষ মরে না। কাঁকড়া বিছের কামড়ে মানুষ মরে যেতেও পারে।

বড় : জুতোর সঙ্গে কাঁকড়া বিছের কী সম্পর্ক?

প্রমোদ : আছে আছে। কিছুই জান না, জন্মে বসে আছ। ওই মুখ বন্ধ জুতোর মধ্যে কাঁকড়া বিছে ঘাপটি মেরে থাকে। সেদিন সন্তোষকে অ্যায়সা মেরেছে। তিনদিন যমে মানুষে টানাটানি। বাচ্চাদের কেড্‌স্, তোমাদের শু সবসময় ঠুকে পরবে।

মেজ : কাঁকড়া বিছে কোথা থেকে আসবে?

প্রমোদ : যখন আসবে তখন বুঝবে কোথা থেকে আসে।

বড় : কিছু আশার কথা বলুন না।

প্রমোদ : আশার কথা থাকলে কী বলতাম না। এটা হচ্ছে নিরাশার যুগ। এই যে তোমাদের বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং কত বছর আগে চেক করিয়েছ?

বড় : তা পাঁচবছর হবে।

প্রমোদ : অদ্ভুত! তোমরা এক-একটি ভূত। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। প্রত্যেক ছ-মাস অন্তর চেক করানো উচিত। আমাদের ওয়েদার তো ভালো নয়। ধরো তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছ। মাঝরাতে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে গেল। ভোরবেলা সব ছাই।

মেজ : তা কেন হবে?

প্রমোদ : শিক্ষিত লোকের মুখে কী অশিক্ষিত কথা। সামান্য শর্ট সার্কিটে কত বড় থিয়েটারটা পুড়ে গেল। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

বড় : কোন্ থিয়েটার?

প্রমোদ : আরে স্টার। স্টার—এর কথা বলছি।

বড় : জ্যাঠামশাই, রাত হল দিনকাল ভালো নয়। এইবার আপনি বাড়ি যান।

প্রমোদ : বাড়ি! এত তাড়াতাড়ি আমি বাড়ি ফিরি না। যাক্, তোমাদের এখানে এককাপ চা খেলুম। এইবার পঞ্চাননের কাছে যাই। খবর পেলুম ওদের বাড়িতে আজ মালপো হয়েছে।

মেজ : আপনি এখানে খেয়ে যান না?

প্রমোদ : পাগল হয়েছ? আমি কি ভিখিরি যে চেয়ে খাব। তোমরা যদি আগেই বলতে, তাহলে ভেবে দেখা যেত। আচ্ছা আসি বাবা। তোমরা ভালো থেকো। সাবধানে থেকো আর ছোটদের নাগালের মধ্যে দেশলাই রেখো না। ও যে কী মারাত্মক জিনিস। বাথরুমে গিজার আছে নাকি?

বড় মিত্তির অপরাধীর গলায় বললে, আজ্ঞে আছে।

প্রমোদ জ্যাঠা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, হয়ে গেল, ও একদিন মারবেই। একমাত্র উপায় বাথরুমের ভিতর একটা কাঠের পিঁড়ি রেখে। ওই কাঠের পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে যা করার কোরো। আচ্ছা চলি।

প্রমোদবাবু চলে গেলেন। বড় মেজকে বললে, কী বুঝলি?

মেজ : সব কথাই শোনার মতো। মানুষকে মারার মেশিন ফিট হয়েই আছে। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের।

গান্ধারী ঝাঁ ঝাঁ করে ঘরে ঢুকল। বড়দা।

কী হল রে?

গান্ধারী দু হাত ভয়ংকর ভাবে নেড়ে বললে, মুজাহিদ, তোমার আদরের বেড়াল মুজাহিদ।

কী করেছে?

গান্ধারী : তোমার পাখির খাঁচার উপর উঠে বসে আছে। ব্যাটা ধুমসো। গোঁফের সাইজ কী? ইয়া, ইয়া। গর্জন তেল মাখায় বোধ হয়। চোখ দু'টো যেন বাঘের মতো। অন্ধকারে ধক, ধক। তোমার ওই বেড়ালের জাত ভালো নয়।

বড় : ওরে গাধাটাকে আগে খাঁচা থেকে নামা।

গান্ধারী : সে আমি নামিয়ে দিয়েছি। একটা চড়ও মেরেছি। এই নিয়ে তিনবার হল। পাখিগুলো ভয়ে চিৎকার করছে। একই বাড়িতে বেড়াল, কুকুর, পাখি, খরগোস, এমন দেখিনি বাপু। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু।

বড় : কেন জঙ্গলে? একই জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হরিণ। থাকে না?

গান্ধারী : মরেও তেমনই।

বড় : তা মরুক।

গান্ধারী : বেশ। তাহলে মরুক। কিন্তু মরার পর মেজাজ খারাপ করলে চলবে না। সেদিন একটা পাখি মরেছিল। আমরাও মরতে বাকি ছিলুম না।

বড় : গান্ধারী। সব ব্যাপারটাই নির্ভর করছে ট্রেনিং-এর উপর। বুঝলি!

ঝ্যান, ঝ্যান করে টেলিফোন বাজল। বড় মিত্তির ফোন ধরল, হ্যালো! ডক্টর মিত্র বলছি।

এখন একেবারে অন্য ব্যক্তিত্ব। মুখে প্রফেশ্যনাল গাম্ভীর্য।

'বার্ন কেস? কে? আপনার স্ত্রী? ভেরি স্যাড। এ তো ভাই আমি কিছু করতে পারব না। সোজা হাসপাতালে নিয়ে যান। এ তো পুলিশ কেস হবে। মানবিকতা, না মশাই ও কথায় আর ভুলছি না, দিনকাল খুব খারাপ।

ফোন নামিয়ে রাখল। মেজ জিজ্ঞেস করল, 'কী কেস'?

বড় : বার্ন।

মেজ : কোথায়?

বড় : ওই যে প্রোমোটার, বিষ্ণুবাবু। তাঁর স্ত্রী বলছেন রান্না করতে গিয়ে। কেউ কি বিশ্বাস করবে? এখন মেয়েদের কিছু হলে রক্ষে নেই। হাজত বাস। তার আগে গণধোলাই, বাড়ি ভাঙচুর। আমরা বিয়ে না করে বেশ আছি। কী বল্ মেজো। শুধু তোর সঙ্গে যদি একটু মনের মিল হত।

মেজ : এটা সিরিয়াসলি বললে?

বড় : ধূর। আমাদের ভালোবাসা, আমার বলার ভাষা নেই। এ কোনওদিন ছিঁড়বে না। শোন্ তোকে একটা কথা বলি। তখন আমি ঘুঁটিটা সত্যিই সরিয়েছিলুম রে।

মেজ : আরে দাবা খেলায় একটু দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে হয়। তা না হলে জমে না। রাজকীয় খেলা যে। শোনো, তুমি একটা ঘুঁটি সরিয়েছিলে। আমি সরিয়েছিলুম দু'টো।

দু-জনের প্রবল অট্টহাসি।

বড় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'একবার যাই। কী বল্?'

'কোথায় যাবে?'

বড় : বিষ্ণুর বাড়িতে! ওর বউটা আমাকে খুব ভালোবাসত রে। দাদা. দাদা করত। ভারি সুন্দর মেয়ে।

মেজ বলল, 'আমিও যাই চলো। তোমাকে একা ছাড়তে ভয় করছে। ওদের বাড়ির সামনে এতক্ষণে গোটা পাড়া ভেঙে পড়েছে।'

বড় বলল, 'দাঁড়া, জুতোটা গলাই।'

মেজ : আমার চটি। চটি পায়ে দিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিলুম। বড় মিত্তির জুতো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভাইকে বলল, চল্।

কয়েক পা হেঁটেই চিৎকার, 'ওরে! ডান-পাটির ভিতর কী একটা খড়খড় করছে। কাঁকড়া বিছে রে। বাঁচাও, বাঁচাও। এ প্রমোদ জ্যাঠার কাজ।'

বড় ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেজ : আররে! তুমি জুতোটা খুলে ফেল না।

বড় : দেখছিস না কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নড়লেই কামড়ে দেবে।

মেজর চিৎকার, 'কুসি! কুসি!'

চিৎকারে সবাই ছুটে এসেছে। দুদ্দাড় করে।

কুসি : এসবের কী?

মেজ : দাদার জুতোর ভিতর কাঁকড়া বিছে।

কুসি বললে, 'তুমি এই সোফাটায় বোসো, দেখি বিছে না আরশোলা?'

করুণ কণ্ঠ বড় মিত্তিরের, 'আরশোলা নয় রে, বিছেই। ফুটিয়ে দিয়েছে অলরেডি। দেখছিস না, ধীরে ধীরে শরীরটা কি রকম নীল হয়ে যাচ্ছে।

কুসি : তুমি আগে বোসো। দাঁড়িয়ে কামড় খাওয়ার চেয়ে শুয়ে-বসে খাওয়াই ভালো।

—বড় মিত্তির ধীরে সাবধানে, সবচেয়ে কাছের সোফাটায় বসল। গোটা

পরিবার ঘরে সমবেত। যেন সিনেমা দেখছে। কুসির পাশে গান্ধারী। হাতে একটা ছোট্ট তবলা ঠোকার হাতুড়ি। বিছেটা বেরোলেই মারবে।

কুসি একটানে জুতোটা খুলে মেঝেতে ঠুকতেই বেরিয়ে এল, একটা মেয়েদের চুল বাঁধার কাঁটা। কুসি সেটিকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন বউয়ের মাথা থেকে খসেছে? সেজ কি তোর? না নকির?'

মেজ বললে, 'বাধা পড়ে গেল। দাদা, আর গিয়ে কাজ নেই।'

'ঠিক বলেছিস। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। ওটা মাথার কাঁটা না হয়ে কাঁকড়া বিছে হ'ল কী হতো? পুনর্জন্ম হল আমার।'

মেজ : কেন হল জান? ওই যে সত্য কথা বললে একটু আগে। ঘুঁটি সরিয়েছিলে। সত্যবাদীকে ভগবান রক্ষা করেন। এসো সৎ পথে থেকে আবার এক রাউন্ড দাবা হয়ে যাক। দাবার ছকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে দুই মিত্তির। এদিকে বড় ওদিকে মেজ। ছকে রাজসৈন্যরা এগোচ্ছে। এদিক থেকে সাদা রাজার বাহিনী ওদিক থেকে কালো। হঠাৎ বড় সোজা হয়ে বললে, 'মেজ! কাজটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

'কোন্ কাজটা?'

'এই দাবা খেলা। এ যেন রোম পুড়ছে আর নিরোরা ব্যায়লা বাজাচ্ছে।'

'তুমি নিরোরা বলছ কেন? নিরো তো একজন।'

'শোনো, নিরো মারা যাওয়ার পর তার স্বভাবটা বেরিয়ে এসেছে। এইবার যার যার ঘাড়ে চাপছে সে-ই নিরো। এই পাড়ারই একটা বাড়িতে এক বধূ আগুনে পুড়ছে। আর আমরা আরামকেদারায় বসে চা সেবন করতে করতে দাবা খেলছি। দাঁড়ে—বসা কাকাতুয়ার মতো মাঝে মাঝে হরে কৃষ্ণ বলছি।'

মেজ মিত্তির বললে, 'কথাটা খুব ঠিক। তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত?'

'পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই উচিত।'

'তাহলে চলো। লেটস গো।'

দুই মিত্তির রাস্তায় বেরিয়ে এল। দু'জনের বয়সের ব্যবধান মাত্র তিন। প্রায় একই রকম দেখতে। লম্বা, চওড়া, সুন্দর। বিষ্ণুর ফ্ল্যাটের সামনে। ছোটখাটো ভিড়। মুখরোচক সব কথা বাতাসে ভাসছে। হঠাৎ একটা কিশোর কণ্ঠ—'কাকু। তুমি এসেছ? তাহলে আমার মা নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে।'

বিষ্ণুর বড় ছেলে। স্কুল বয়। অন্ধকারে রাস্তার ধারে। বড় অসহায়। অন্য এক মিত্র—ডক্টর মিত্র, এই বার ভিড় ভেদ করে দোতলায় উঠছেন। এ পাড়ার প্রাণের মানুষ—মিত্তির ডাকতার।

এ কোন সকাল

ব্রজবাবু বলে দিয়েছিলেন, 'স্টেশনের বাইরে এসে গোপাল গোপাল বলে বার কতক ডাকবে। একটা সাইকেল রিকশা তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। ব্যাস। তোমার তখন একটাই কাজ—উঠে বসা তারপর আমার বাড়িতে আসা। তোমার আসতে আসতে রাত হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে দেখা হবে না। দেখা হবে সকালে। তাহলে তুমি কি করবে? পদ্ম পদ্ম বলে ডাকবে। ব্যাস্, তোমার আর কোনো ভাবনা নেই। তবে একটা শাস্ত্রবাক্য মনে রাখবে—পুরুষ জাতির নারী জাতি থেকে সাবধান থাকা উচিত। তোমার কি রকম ধাত? এই যেমন বলে না—সর্দির ধাত, পিত্তির ধাত—সেই রকম তোমার কি প্রেমে পড়ার ধাত?'

'আজ্ঞে না। ও ব্যাপারে আমি খুব সাবধান। আমি আমাদের বাড়িতে দোতলার যে ঘরে থাকি, সেই ঘরের দক্ষিণের জানলা, কী শীত, কী গ্রীষ্ম আমি খুলি না।'

'না খোলার কারণ?'

হুঁ বুঝেছি—মেয়েটিকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। নজর কাড়ে। সেই কারণেই জানলা বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা। বয়েসের খেলা। কিছু করার নেই। তোমার বয়সে আমাদেরও ওইরকম হত। কেন হত —বলতে পারব না। বোধ হয় বায়োলজি। নগেনকাকার মেয়ে কম ভুগিয়েছে? শেষে বিয়ে করে বাড়িছাড়া হয়ে শান্তি। বাবা বললেন, কুলাঙ্গার, ওর মুখদর্শন করব না। মা হাত দুটো ধরে কাঁদে আর বলে—'বাবা, তুই আমায় বিধবা করবি?' আর নগেনকাকার শাসানি, 'আমার মেয়ের যদি একটু এদিক-ওদিক হয়—তোমাকে আমি মহারাজা নন্দকুমারের মতো ফাঁসিতে লটকাবো।' সেকালের মানুষরা ছিল পিকুলিয়ার। বিয়েটাই বুঝত, প্রেম বোঝার চেষ্টা করত না। যার বিয়ে তার কোনো পছন্দ-অপছন্দ থাকবে না। সে ব্যাটা যেন মুটে।

এই ব্রজবাবুর পরিষ্কার পরিচয় আমি এখনো জানি না। বয়সে আমার চেয়ে অনেকটা বড়; কিন্তু আমার বন্ধু। পুরীতে আলাপ। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলুম—মানুষটা আর পাঁচটা মানুষের মতো নন। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ভেতর ছাপান্ন হাত হৃদয়। এক ঘুষিতে যে কোনো মানুষের চোয়াল তুবড়ে দিতে পারেন। কিন্তু কেউ দুঃখে আছে শুনলে আগে বেশ খানিক কেঁদে নেবেন, তারপর ভাবতে বসবেন—কি করা যায়। শুধু ভাববেন না, একটা কিছু

করবেনই। পুরীর সৈকতে বসে থাকতে থাকতে বললেন, 'সেই আদিকাল থেকে অকারণে কত ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ঢেউয়ের বরাত মানুষের মতোই, আস্ত থাকার উপায় নাই। বুঝলে ইয়াংম্যান?'

আমি বলেছিলুম—'অত ভাবতে পারি না। আসলে আমার অত পয়সা নেই। আমাকে আজকে ভাবতে হয়, কাল কি ভাবে চলবে।'

'ভেরি গুড। এইরকমই একজনকে খুঁজছিলাম যে ভাবে না, কাজ করে। ঝিনুকের মতো কুড়িয়ে পেলুম। ওদিকের কি অবস্থা?'

'নিল্।'

'এ রকম হওয়ার কারণ?'

'ওই যে বাঁচার কায়দাটা রপ্ত না করে বাঁচতে এলে যা হয়।'

'তাহলে তুমি আমার রাজত্বে একদিন আসছ দীর্ঘদিনের জন্যে— কাজ আছে।'

সেই আসা। স্টেশনের বাইরে আলো-অন্ধকার রাত। গাছপালায় ঝুপঝাপ রাত-বাতাসের শব্দ। দু-একটা দোকান। একটা পথ হুকের মতো বাঁকা। মচমচে চালাবাড়ি। ছোট একটা খাল অনেকটা নিচুতে। জল জল গন্ধ। প্যান প্যান করে এক 'রিডের' একটা হারমোনিয়াম বেজে উঠল মাঠের ধারের একটা চালায়। খানিকটা জায়গা জুড়ে বেশ আলো। কালোকালো অনেক মাথা।

'গোপাল' বলে একবার ডাকতেই মাটি ফুঁড়ে একজন লোহাপেটা মানুষের আবির্ভাব। হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ুন তে-চাকায়।' প্রশ্ন হল, 'জোরে না আস্তে?'

'সে যা হয়।'

'তা হলে মাঝামাঝি। ধরে বসুন। পড়ে গিয়ে কেলেঙ্কারি করবেন না। খাল-বাঁধের ওপর দিয়ে যখন যাব একটু ভগবানের নাম। ভীতু?'

'ততটা নয়।'

'হ্যাঃ, মরে গেলেই বা কি? হাড়গোড় ভেঙে পড়ে থাকাটাই বেকার।'

মাঠের চালায় কীর্তন শুরু হয়েছে। খোল-করতাল। চারদিকে কেমন 'মন কেমন করা' রাত। এই রকম রাত কেন জানি না অনেকদিনের পুরনো একটা দরজা খুলে দেয়। ভেতরে একটা উৎসব চলছিল, হঠাৎ যেন থেমে গেছে। এপাশে, ওপাশে অনেক চিহ্ন ছড়ানো। এই রাতেরই ভাঁজে ওই রাতটি লুকনো, যে-রাতে সামনের বাড়ির মেয়েটি আগুনে পুড়ল্। সেই থেকে মাঝরাতে একটা বাতাস এসে খালি শাসায়—'তোমার জন্যে, তোমার জন্যে।

ব্যাটা বামুন, হৃদয়হীন, পইতেটা তোর ছিঁড়ে ফেল। ওইটাই তোকে অমানুষ করেছে।'

।। দুই।।

পদ্ম পদ্ম বলে ডাকতে হল না। দরজা খোলা। একটা কপাট ধরে 'আহা মরি' ভঙ্গিতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বলার আগেই বললে, 'আইয়ে জনাব।'

রিকশা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি। শরীর সামান্য টলছে। এতটা পথ। লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে। 'ভাড়া? কত দোবো ভাই?'

রিকশাদাদার নাম জানি না। আমার ব্যাগটা নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে গানের সুরে বললে, 'ভাড়া তো লাগবে না। ব্রজবাবুর হাওয়াগাড়ি টাকায় চলে না।'

পদ্ম বললে, 'ঢুকে পড়। বেশি রাতে এদিকে খটাশ বেরোয়। কামড়াতে পারে।'

'খটাশ, নামটা শোনা। চোখে দেখিনি।'

'দেখে কাজ নেই। চলে এস, চলে এস। দরজা বন্ধ করি।'

ভেতরে পর পর বড় বড় ঘর। 'এত বড় বাড়ি, লোকজন কোথায়?'

'মরে গেলে কে কি করতে পারে? একসময় গমগম করত। যা শুনেছি। জমিদার কুঞ্জবিহারী, পাইক-বরকন্দাজ, কামান, গাদাবন্দুক, কয়লা, চা, মাইকা, নীলের ব্যবসা। সব তীর্থস্থানে একটা করে বাড়ি, হরিদ্বারে ধর্মশালা। কোথা থেকে এক সাধু এসে কানে ফুসমন্তর দিলে। একদিন সকালে কুঞ্জবিহারী নেই। কোথাও নেই। এই তোমার ঘর। আগে চা খাবে, না চান করবে?'

'সে আপনি যেমন বলবেন।'

'নাও, আমি বলছি তুমি, এ বলছে আপনি। এটা কোন জেলার ভদ্দরলোক। এই, আপনি-টাপনি ছাড়ো। মেয়ে দেখলে ঘাবড়ে যাও বুঝি?'

'আমি আগে একটু বসব?'

'বোসো। তা হলে চা খাও। তারপর না হয় চান করবে।'

'এই এত বড় ঘরে আমি একা থাকব? বড় বড় জানলা। ছাতটা সেই কত উঁচুতে। এ-দেয়ালে, ও-দেয়ালে বড় বড় আয়না।'

'পাশের ঘরে আমি থাকব। যা ভয় ওই রাত একটায়। একটা থেকে দুটো। সেই সময়টুকু পার করে দিতে পারলেই হল। বাজে বোকো না তো। চা।'

'তা আমি কি এই ঘরে ঘটের মতো বসে থাকব?'

'আমার চা করায় সাহায্য করবে চলো।'

'এই বাড়িতে একসময় তিনটে রান্নাঘর ছিল। একটায় গৃহদেবতার ভোগ। একটায় বাড়ির সকলের। আর একটায় কর্মচারীদের। মায়ের মন্দিরে রোজ বলি হত। তিনটে পুকুরে রোজ মাছ উঠত। চার-পাঁচটা শিলে চার-পাঁচজন মহিলা দুলে দুলে বাটনা বাটতেন। আসতেন বাগদিপাড়া থেকে। সেইরকম সব চেহারা। এদের পুরুষরা সব জমিদারের লেঠেল। কেউ কেউ নামকরা ডাকাত।'

পদ্ম এই সব বলতে বলতে ছোট রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছে। বড় দুটো বাড়ির বাইরে। বাহান্ন বিঘে জমির ওপর এই বাড়ি। পদ্ম বললে, 'কোনো মানে হয়। এত কে সামলাবে? তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারো?'

'কেউ চড়িয়ে দিলে পড়ে না যাওয়ার চেষ্টা করব।'

'তাহলে কাল সকালে।'

'মানে?'

'একটা ঘোড়া আছে। আমি পারি। তোমাকে পারাবো।'

'যদি স্লিপ করে পড়ে যাই।'

'দুজনেই পড়ব। তুমি তো আমাকে জাপটে ধরে বসে থাকবে।'

'এ কি সিনেমার শুটিং? তোমার মতো সুন্দরী। লোকে ছ্যা ছ্যা করবে। ব্রজবাবু...'

'শোনো, ব্রজবাবু তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে। বাবু, বাবু—একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারছ না? তুমি কি গো? কলকাতার ভূত। ভদ্রতার ঠ্যালায় অস্থির। কেমন টোম্যাটোর মতো ফুলে ওঠে। হি হি।'

'কি বলবো?'

'তোমার দাদা আছে?'

'কেউ নেই। আপাতত আমি পৃথিবীতে একা।'

'নেই কেন?'

'একা ফেলে পালিয়েছে। দেখছে আমি কি করি। আমিও তেমনি। একবারও তাদের কথা মনে আনি না। হোটেল আছে খাই। একটা বিছানা আছে শুই। একটা চাকরি আছে করি। অনেক বই আছে পড়ি, ট্রেন আছে ঘুরি।'

'স্টপ, স্টপ, স্টপ। অনেক বকেছ। তুমি বলবে দাদা। পৃথিবীতে দাদার মতো সম্পর্ক আর নেই।'

'আমি মনে করি দিদির মতো কেউ হয় না। কান মলে চুমু খায়। পিটিয়ে কাঁদতে বসে। তুমি আমার দিদি হবে?'

'মন্দ বলনি। পেটাপিটি করার মতো আমারও একটা ভাইয়ের দরকার ছিল। শুনেছি, তুমি একজন লেখক।'

'ঘোড়ার ডিমের লেখক। সব বাঙালিই লেখক। লেখক জন্মায় ইউরোপ, আমেরিকায়।'

'তুই—বলতে পারবি?'

'খুব পারব।'

ছোট রান্নাঘরটা একেবারে ফার্স্টক্লাস। যেন ঠাকুরঘর। গ্যাসের উনুন। চিমনি লাগানো সাবেক উনুনও রয়েছে। ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের কেটলিতে চুঁই চুঁই করে জল ফুটল। লম্বা একটা বারান্দা এধার থেকে ওধারে ঘুরে চলে গেছে। কত রকমের গাছ। ভুরভুরে ফুলের গন্ধ। একটা পৃথিবীর মধ্যে ক'টা পৃথিবী ঢোকানো আছে। বারান্দাটা ধরে একা একা সাহস করে এগোচ্ছি। একেবারে শেষে বিশাল একটা ঘর। কত বই। এই তো লাইব্রেরি। যাঃ হয়ে গেল। পায়ে শিকলি। আর আমাকে পায় কে। কানে এল সুরেলা একটা ডাক —'কোথায় গেলি রে হুম্মান।'

মেয়েদের এই গুণ—কত সহজে সহজ, কত সহজে আপন হয়ে যায়। আমি আমার খাতায় লিখতে পারি—নারী! মূলেও যেমন উন্মূলেও তেমন,

সংসার তোমার মর্জি,
সুখের সুখ দুঃখের দুখ
ভয়ংকর এক নিয়তি।।

এত দূরে চলে এসেছি যে পদ্মকে দেখাচ্ছে এতটুকু একটা ছোট মেয়ে। কি মজার বাড়ি। ভেতরে যেন একটা গ্রাম ঢুকে আছে। ছেলেবেলায় আমি আর আমার বন্ধু পল্লব বসে বসে ভাবতুম—আমরা একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ব। রোজ একটু একটু করে। খুঁড়তে খুঁড়তে চলে যাব মিশরের পিরামিডে। ওপর থেকে কেউ দেখতে পাবে না, জানতে পারবে না। নিজেদের ইচ্ছেমতো যাবো আর আসবো। নীলনদে সাঁতার কাটবো। ভোরবেলা ট্রাউট মাছ ধরবো। দুপুরবেলা গনগনে রোদে মরুভূমিতে উটের পিঠে চড়ে চলেছি, চলেছি। মরীচিকা দেখবো।

ও বাবা। এখানে কল্পনার স্থান নেই। কড়া তামাকের মতো কড়া বাস্তব। ওরে তোকে চাকরি করতে হবে। সংসার সামলাতে হবে। কত দায়-দায়িত্ব।

পল্লবটা তো বাইরেই চলে গেল। এখন একেবারে অন্যরকম। আমি তেমন একটা কেউকেটা হতে পারলুম না। মাঝে-সাঝে দেশে এলেও অনেক ওপর থেকে কথা বলে। যেন ছ'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি রাস্তায়।

এমনই অতীত ভাবনা, এখুনি পদ্মর সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হচ্ছিল।

'বাব্বা। কি এত ভাবছ? কোন জগতে আছ? এই স্ল্যাবটার ওপর বসে চা পান করো।'

'তোমার?'

'এক্ কাপই করেছি।'

'হাফ্ হাফ্। আর একটা কাপ। চা কখনো একা খেতে নেই।'

'তোমার কাছে বেশিক্ষণ বসা যাবে না। আমাকে এখন রান্নায় নামতে হবে।'

'আজকের রাত কথা বলার রাত। একটু দেরিতে হলেও চাঁদ উঠেছে দেখ। অপরাধীর মতো মুখ। দেরিতে এসেছে। মায়ের কাছে বকুনি খেয়েছে। খেলার মাঠ থেকে দেরিতে ফিরলে আমাদের যা হত'

'তুমি বুঝি খুব গল্প করতে ভালোবাসো?'

'কে আর শুনবে? নিজেকেই নিজে গল্প বলি। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি। খেলা করি। মনে মনে দেশ-বিদেশে বেড়াতে যাই। কোনো একটা ভালো হোটেলে উঠি। ঘরে ঢুকে প্রথমেই উত্তরের জানলাটা খুলে দি। একেবারে নাকের ডগায় সেই পাহাড়টা।'

'কোন পাহাড়?'

'পাহাড়টার নামই 'সেই পাহাড়'। মাথার ওপর সাদা একটা জৈন মন্দির। পাহাড়ে তিনটে গুহা আছে। একটা আমার। পাথরের গা বেয়ে পিঁপড়ের সার উঠছে তীর্থযাত্রীদের মতো। পাথরের ফাটলে বিরাট একটা মৌচাক। উত্তরের জানলাটা খুললে হুড়মুড় করে সব ঘাড়ে এসে পড়ে।'

'জায়গাটার নাম কি?'

'সেই জায়গা, হোটেলটার নামও 'সেই হোটেল।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?'

'অবশ্যই'।

'আমাকে তোমার কেমন লাগছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'বুঝে কাজ নেই।'

'ভাই। মেয়েদের কি সহজে বোঝা যায়?'

'কটা মেয়ের সঙ্গে মিশেছ?'

'এই একটা।'

'তোমাকে কি করতে ইচ্ছে করছে জানো—মাটিতে ফেলে আগা-পাশতলা বেশ করে পেটাতে।'

'পড়েছি তোমার হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

'প্রেমের গল্প লিখেছ কোনো দিন? প্যানপ্যানে, ঘ্যানঘ্যানে?'

'রাম-রমা, শ্যাম-শ্যামা। ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে ল্যাম্পপোস্টের মতো। কখন আসবে সে। ল্যাম্পপোস্ট ভেবে একজন দাদের মলমের হ্যান্ডবিল মেরে দিয়ে গেল। খুজলি হতে সাবধান।'

'আমরা প্রেম করব না।'

'না, আমরা ভালোবাসব। এখন আমার কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে।'

'রান্না জানো?'

'খুব জানি।'

'তা হলে চলো।'

দূর থেকে বিশাল একটা যন্ত্রদানব জমাট অন্ধকারের মতো শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে। একটা ট্রাক্টর। সামনে এসে দাঁড়াল। চার-পাঁচজন ধুমধাম লাফিয়ে পড়ল। মালপত্র মাথায় নিয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। নির্জন দিকটা মুহূর্তে কলরবমুখর হয়ে উঠল। কেউ একজন কোনো কারণে হা হা করে খুব হাসছে। খুব ভালো লাগছে। এতক্ষণে বেশ জমজমাট হল।

'পদ্ম?'

'বলো।'

অ্যাঁ—এই 'বলো' শব্দটার মধ্যে অনেক কালের কিছু আছে কি? মনটা হঠাৎ এমন করে উঠল কেন? কে কাকে এমন করে বলতে পারে। সে যে বড় আপনজন। তা হলে? জীবনপথে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। একটা শব্দই কানে এসেছে—কর্তব্য, কর্তব্য। কোথাও একছিটে ভালোবাসা জোটেনি। সম্পর্কের উর্দিপরা একদল নারী-পুরুষের কাছে জুটেছে 'কাউন্টার সার্ভিস'। উঠতে-বসতে বুঝিয়ে দিয়েছে 'ফেল কড়ি মাখো তেল, আমি কি তোমার পর।'

'কি হল? চুপ করে গেলে? কি বলছিলে?'

'অনেক লোক। এখন কি ভালো লাগছে।'

'ওদিকে একটা পাড়া আছে। কাল সকালে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব।

মন্দির আছে। সুন্দর পুকুর আছে, পদ্ম আছে।'

রাত এগোচ্ছে, বেশ এগোচ্ছে। টিক্ টিক্ দেয়াল টিকটিকি।

খাওয়া-দাওয়া ঝপাঝপ শেষ হল। খুব একটা ঝামেলার কিছু ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছে, বাইরেটায় গিয়ে কখন বসব চাঁদের আলোয়। বাতাসে নাচছে গাছের পাতা। রুপোর পোশাক পরা নর্তকী।

বেশ কিছুটা পরে পদ্ম এসে আরামকেদারায় বসল। সেকালের জিনিস। ইচ্ছে করলে ঘুমিয়েও পড়া যায়। সোজাসুজি চাঁদের আলো এসে পড়েছে মুখে।

'পদ্ম।'

'বলো।'

'তুমি খুব সুন্দরী।'

'আমার মা ছিলেন আরো সুন্দরী।'

'তোমার মায়ের কথা বলবে? ব্রজদা তোমার কে হন?'

'আমার কাকা।'

'তোমার বাবা?'

'নিরুদ্দেশ। হয় তো সন্ন্যাসী। উত্তর ভারতের কোথাও থাকতে পারেন, নাও পারেন। আমি জানি না। আমি তাঁকে দেখিনি। ভীষণ ভালো সেতার বাজাতেন। আমার মা-ও বাজাতেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই বাড়িতে এসেছিলেন। ছিলেন কয়েকদিন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এসেছিলেন। সে সব অতীত। মনে করতে নেই। জানো, বয়সেরও বয়েস হয়।'

'বাঃ ভারী সুন্দর বললে। তুমি সাহিত্যিক। আমার মনে হয়, তুমি নাচ জানো।'

'কি করে বুঝলে?'

'তোমার পা, তোমার হাত, তোমার চলা, তোমার ছন্দ, তোমার আঙুলের প্রতিটি ভঙ্গি এক একটি মুদ্রা।'

'একসময় মায়ের মন্দিরের পূজারী ছিলুম। পূজার সময় অনেক মুদ্রা দেখাতে হয়, আর আরতি তো স্থির নৃত্য!'

'খুব বড় ঘরের বড়লোক ছেলেকে তোমার বিয়ে করা উচিত। রাজরানী হবে। তবে বনেদী বড়লোক। একালে অনেক নতুন বড়লোক হয়েছে। তাদের জাত নেই। বেশিরভাগ অশিক্ষিত, অসভ্য। প্যান্ট-কোট-টাই-পরা শিমপাঞ্জি।'

'আমি বিয়ে করব না। আমার কাকাকে কে দেখবে। আমার জন্যে বিয়ে

করেনি। আমাকে মানুষ করেছে। বাবার নিরুদ্দেশের পর মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেবল আত্মহত্যার চেষ্টা করত।'

'মেয়েরা বিয়ে না করলে শেষ জীবনে খুব কষ্ট পায়।'

'আমার সে ভয় নেই। আমার একগাদা ছেলে-মেয়ে। কাল সকালে দেখতে পাবে। আমার মায়ের কাছে যাবে?'

'নিয়ে যাবে?'

বাড়িটা তিনতলা। দোতলায় ওঠার তিনটে সিঁড়ি। পেছনের সিঁড়িটা যেন গুপ্ত। বোঝার উপায় নেই। অনেকটা হেঁটে যাওয়ার পর বাঁদিকে একটা দরজা। দরজাটা খুললে একটা ঘর। একটু এগুলেই দুটো দেয়ালের মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে। ডানদিকে। খুব শৌখিন। আপনজনের মতো। তিনটে বাঁক। উঠে এলুম একটা ছোট্ট ঘরে। ভারী রহস্যময়। এটা মূল বাড়ির অংশ কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এই ঘরের ঝকঝকে পালিশ করা দরজাটা খুলতেই মস্ত একটা ঘর। সুন্দর সাজানো। পদ্মফুলের মতো গোল একটা বিছানা। নীল ভেলভেটে মোড়া। দেয়ালে বেশ বড় একটা অয়েল পেন্টিং। পদ্মর মা। নূরজাহানের মতো সুন্দরী। মেঝের বেশ কিছুটা জায়গা পুরু কার্পেটে ঢাকা। একপাশে ঝকঝকে একটা সেতার। আরো কত কি! জানা, অজানা সব জিনিস।

পদ্ম বললে, 'এ সবের কি মূল্য বলো? মানুষের মাথাটাই আসল। সেটার গোলমাল হলে, জীবনের আর কি থাকে?'

পদ্ম কার্পেটের ওপর বসে পড়েছে। ঘরে ছড়িয়ে আছে কত স্মৃতি। সুন্দর একটা গন্ধ ঘরের বাতাসে ভাসছে। ফুলের গন্ধ। পদ্মর চোখ দুটো ছল ছল করছে। আমি ভাবছি—দুনিয়াটা এত তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছে যে সেখানে এই সব ভাবালুতা আর থাকবে না। স্মৃতি আবার কি? বাঁচতে বাঁচতে বাঁচাটাকে ফুরিয়ে ফেলে বিস্মৃতিতে হারিয়ে যাও। এই সব আর ক'দিন ধরে রাখতে পারবে। এই সব বাড়ি-ঘর-জমি-জায়গা দখল করে নেবে। টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। পার্টি অফিসের দাদারা, দেশ যাদের বড় কিছু, ভালো কিছু ভাববার ক্ষমতা নেই। যারা মৃত্যু দিয়ে, নির্যাতন নিয়ে ঘোরে।

'পদ্ম?'

'বলো।'

'তোমার এই 'বলো'-টা এত সুন্দর। বারে বারে তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে করে। হয়তো বলার তেমন কিছুই নেই। তোমার চোখে জল কেন?'

'এই মায়ের কথা কিছুতেই যে ভুলতে পারছি না ; আর সেই হারিয়ে যাওয়া বাবার প্রতি বিদ্বেষ। বাবার জন্যেই মায়ের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। বাবার মধ্যে অদ্ভুত একটা সন্দেহবাতিক দেখা দিয়েছিল। কাকুকে সহ্য করতে পারতেন না। একদিন আমি দরজার আড়াল থেকে এই ঘরে দু'জনের কথা কাটাকাটি শুনেছিলুম। অতি বিশ্রী সে-সব কথা। বাবা বলছেন, 'তুই তো আমার আদ্দেকটাই নিয়ে নিয়েছিস। বাকিটা আর পড়ে থাকে কেন। পদ্ম কার মেয়ে তা-কি আমার জানতে বাকি আছে? এও জানি, তুই আমাকে একদিন এই পৃথিবী থেকে লোপাট করে দিবি। তোরও তো জন্মের ঠিক নেই।' ছি-ছি! বাবার মুখে এই কথা।'

পদ্ম দু'হাতে মুখ ঢাকল। আমি কি করব—বুঝতে পারছি না। এক রাতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একটা পরিবারের অনেকটা ভেতরে চলে এসেছি। যেমন ছোট্ট তিন বাঁক সিঁড়ি ভেঙে এসে গেছি এই বড় বাড়ির গোপন এলাকায়। একটা আর একটার মধ্যেই ঢুকে আছে। যেমন পদ্মর মধ্যে রয়েছে আর একটা পদ্ম।

আমি খুব সাবধানে দূরত্ব বজায় রেখে তার পাশে এসে বসলুম। আমি তো একটা মানুষ। এক ধরনের জন্তু। ভয়ংকর জন্তু। ফলের জন্যে কাজ করে আবার কাজের ফলে ভুগে মরে। ছটা ইন্দ্রিয় যেন চেন-বাঁধা ছটা তাগড়া কুকুর। বড় হয়ে আমার যৌথ পরিবারের কিছু কিছু বেচালের ঘটনা আমি শুনেছি। তাঁরা আমার পূর্বপুরুষ। সেই সব বীজ তো আমার রক্তে আছে! নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করি না। তাই দূরে রাখি নিজেকে। আর শুনতে পাই—ভেতরের দৈত্যদের অট্টহাসি— 'তোর দেহটা না পাই মনটা তো আমাদের কব্জায়।'

পদ্ম আমার দিকে মুখটা তুলে ধরল। কি সুন্দর। এ কোন দেবী! চোখের জল গাল বেয়ে নামছে। বিন্দু বিন্দু মুক্তো।

খুব অন্তরঙ্গ গলায় বললে, 'একটা জিনিস দেখবে?'

কোনোরকম সঙ্কোচ না করে পিঠটা খুলে দেখাল। মার্বেল পাথরের মতো সাদা। গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। কোনাকুনি পড়ে আছে। বললে, 'আঙুল দাও।' ভয়ে ভয়ে আঙুল ফেলে দেখলুম। 'মা একদিন হঠাৎ ছুরি চালিয়ে দিয়েছিল, তখন সে কি চেহারা। যেন ভৈরবী! 'তুই আমার কলঙ্ক, তুই আমার কলঙ্ক।' সেদিন কাকু আমাকে না বাঁচালে তুমি আজ আর আমাকে দেখতে পেতে না।'

আমার বয়েস যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। সেই কোন শৈশব থেকে নারীর

ওপর হরেক রকমের অত্যাচার দেখতে দেখতে, বড় হতে হতে এই একটা বয়সে এসে ঠেকেছি। এও দেখেছি মেয়েদের ওপর মেয়েদের অত্যাচারই বেশি। তখন তাদের হাবভাব নৃশংস হয়ে ওঠে। পদ্মকে দেখে আমার ভেতরটা মোচড়াতে শুরু করল। অতীত আমি মুছে দিতে পারব না। বর্তমানেই বা কি করতে পারি! তৃতীয় কেউ আমাদের দু'জনকে এইভাবে বসে থাকতে দেখলে—সাধু সাধু বলবে না নিশ্চয়। অপবাদের বোঝার ওপর আরো কিছু চাপিয়ে দেবে।

পদ্ম বললে, 'সময় সময় মনে হয়, আমি এই বাড়ির কেউ নই।'

'এ তোমার ভুল ধারণা। তুমি এই বাড়ির সব কিছু। ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে আমার সেই রকমই মনে হয়েছে।'

'এখানে সংসার কোথায়? কে আছে আমার?'

'কি বলছ তুমি? ব্রজদার মতো মানুষ হয় না।'

'ক'দিন?'

'মানে?'

'ব্লাড ক্যানসার হলে মানুষ ক'দিন বাঁচে।'

হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম। ব্রজদা চলে গেলে কি হবে? চারপাশে রাজনীতির ঘোলাজল। হাঙর,.কুমির। পদ্মর মাথায় আমার ডান হাতটা রাখতেই তার শরীর কেঁপে উঠল।

।। তিন।।

বিশাল ঘর। যথেষ্ট বড় বিছানা। জানলার বাইরে চাঁদের আলোর রাত। এক দেয়ালে বড় একটা বিলিতি ঘড়ি। ঝকঝকে পেন্ডুলাম। টক টক শব্দ করে না। খস্ খস্। যেন সিল্কের গাউন পরা কোনো বিদেশিনী হাঁটছে। বিছানার একধারে বসে পদ্ম বললে, 'তুমি কিছু মনে করলে?'

'মনে করব কেন?'

'আমি কারোকে আমার জীবনের কথা বলি না। কেন জানি না তোমাকেই বলে ফেললুম। মনে হল, তুমি আমার খুব আপনজন।'

'তুমি এখন আর আমার বাইরে নেই। আমার ভেতরে এসে বসেছ। আমার মনের অবস্থা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। একজন গায়ক যখন খুব ভালো একটা গান গায় তখন তার মনের অবস্থা যেমন হয় আমার মনের অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম।'

'জানি না কি হল! আমার খুব লজ্জা করছে।'

'তোমাকে আমার খুব আপন লাগছে। মনে হচ্ছে, কতকালের পরিচয়।'

'এইবার শুয়ে পড়। আমি ঐ পাশের ঘরেই আছি। দরজা খোলাই থাকবে। ভয় পেয়ো না। নানারকম শব্দ শুনতে পাবে। কিছু দেখতেও পার। তবে ওসব কিছু না। হঠাৎ বাইরে বেরিও না। হঠাৎ আমি যদি তোমাকে এসে ডাকি, তাহলেও না। কারণ, সেই আমিটা আমি নই।'

'তার মানে?'

'মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখবে। পা দুটো মাটিতে আছে কি-না। যদি ভেসে থাকে, বুঝবে অন্য কেউ।'

'অন্য কেউ মানে?'

'সে আমি তোমাকে পরে বলব। তিনটে রাত কেটে যাক।'

'একই ঘরে আমরা দুজনে শুলে বদনাম হবে? আমার কোনো চরিত্রদোষ নেই। আমি নদী, জল, তরঙ্গ, গাছ, পাতা, অক্ষর, রঙ, তুলি নিয়ে জীবন কাটাতে চাই।'

'এর মধ্যে আমার স্থান তাহলে নেই?'

'তাহলে বলি, একহাঁড়ি দই। দু'জনের ঘোর তর্ক। দই বলছে—আমিই সব। হাঁড়ি বলছে, মূর্খ। আমি তোমার আধার, আমাতেই তুমি আছ। আমি না থাকলে, তুমি কোথায় থাকতে? আমার ভেতরের পদার্থটা তোমার আশ্রয়ে স্থান করে নিয়েছে।'

'তুমি লেখক।'

'আর তুমি যে সেই লেখার বিষয়—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি। পদ্ম!'

'বলো! তুমি বারবার এমন করে ডাক কেন?'

'তোমার ওই 'বলো' বলাটা শুনবো বলে।'

'শোনো, রাতে যদি কোনো অদ্ভুত শব্দ শোনো, যদি কিছু দেখো, তাহলে ভয় পাবে না। আমি এই পাশেই আছি।'

পদ্ম তার ঘরে চলে গেল। দরজার ভারী পর্দাটা কিছুক্ষণ দুলল। চারপাশ স্তব্ধ। রাত বুঝি এইবার পৃথিবীর আসনে ধ্যানে বসবে। যখন চোখ খুলবে তখন ভোর হবে। তার আগে নয়। পৃথিবীর এই দিকটা তখন পড়ে থাকবে ছেড়ে যাওয়া আসনের মতো।

আমি ঘুমোতে পারি না। চোখ বোজালেই সেই অগ্নিদগ্ধ মেয়েটি এসে

দাঁড়ায়। বলে না, কিছুই বলে না। শব্দহীন অন্ধকারে পুড়ে যেতে থাকে ; কিন্তু চোখ দুটো পোড়ে না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ক্ষমা, ক্ষমা! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আমি কেমন করে বুঝব—তুমি আমকে ভালোবেসেছিলে।

হঠাৎ ঘরে একটা বাতাস ঢুকে পড়ল। বিশাল একটা অজগর সাপের মতো। এ-পাশে, ও-পাশে নানা জিনিস ছিটকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। পদ্ম ছুটে এসে বিছানায় আমাকে তার পুরো শরীরটা দিয়ে চেপে ধরে হইল। মৃত্যুর মতো শীতল হাওয়া। বেশ বুঝতে পারছি, বিছানাটা ভিজে উঠছে। পদ্ম ক্রমান্বয়ে আমার কানের কাছে বলে চলেছে, 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।'

।। চার।।

সকালবেলা পদ্ম বললে, 'তুমি কি তাহলে চলে যাবে?'

'কেন? এমন কথা বলছ কেন?'

'কাল রাতের ঐ ঘটনার পর।'

'অবশ্যই না।'

'তাহলে আর একটা কথা বলি, কাকু মাদ্রাজে চেক-আপের জন্যে গেছে। একমাসের আগে ফিরবে না। সব দায়িত্ব তোমার ওপর। আর তোমার দায়িত্ব আমার ওপর।'

'আমি আমার স্বার্থেই তোমার কাছে থাকব। আমাকে একটা প্রেত তাড়া করে ফিরছে।'

'ভূত-প্রেতে বিশ্বাস ভালো নয়। কারোকে বোলো না। হাসবে।'

'কাল রাতের ঘটনা ভুলে গেলে?'

'ওটা ভূত-প্রেত নয়। একটা শক্তি ঢুকে পড়েছিল। তাহলে ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাতকে কি বলবে! নাও, নাও আর দেরি নয়। চলো, বেরিয়ে পড়ি। তোমার সাম্রাজ্যটা একবার দেখে নাও।'

আঃ। বাইরে এসে প্রাণটা যেন বাঁচল। এতক্ষণ যেন জাদুঘরে আটকে গিয়েছিলুম। বাইরে থেকে বাড়িটার দিকে একবার তাকালুম। ইংরেজ আমলের। হেস্টিংস, ক্লাইভরা এইরকম বাড়িতেই থাকতেন। 'বড়' মাত্রেই রহস্য। চারদিকে চারটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। দূরে দূরে। গাছপালার আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে। কোথায় কতদূরে গেছে জানি না। তবে ডাকছে। চলে এসো। জীবন এক মস্ত মহাকাব্য। শুরুও নেই, শেষও নেই। যেখানে আছ সেখানেই শুরু, যেখানে তুমি নেই সেইখানেই শেষ। এই সকাল—এতদিন যে

সকালে ঘুম ভেঙেছে, সে-সকাল নয়।

পদ্ম যেন এইমাত্র ফুটে ওঠা একটা ফুল। যতবার তাকাচ্ছি ভেতরের আমি-টা বলে উঠছে 'বাপ রে!' বিদেশী পোশাক। এইরকম পোশাকে পশ্চিমী মেয়েরা, হলিউডের অভিনেত্রীরা জিমে যায়।

'দৌড়াতে পারবে?'

'কোন দিকে?'

'সামনের দিকে। স্টার্ট।'

দু'জনে দৌড়তে শুরু করলুম। সুন্দর পথ। ঝোপ-ঝাড়। ফুল, লতা। মাঝে মাঝে সবুজের আচ্ছাদনী। বাহারি বাঁশগাছ। এপাশ থেকে ওপাশে পাখি উড়ে যাচ্ছে পায়ের শব্দে। দৌড় খুব জমেছে। দুটো কুকুরও আমাদের সঙ্গে ছুটছে। দূরে একটা বড় মাঠ। একদল বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে সেই মাঠে। আমরা কাছাকাছি আসতেই তারা সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, 'দিদি, দিদি।'

এখানে পদ্মর বয়সী আরো দুটি মেয়ে একই রকম পোশাকে। পরিচয়ের পালা শেষ হল। এরা দুই যমজ বোন। সরলা আর তরলা। একমুখ হাসি। প্রাণবন্ত। বাইরের জগতের খবর রাখে না বলেই এমন তরতাজা।

পদ্ম বললে, 'এইবার তুমি কি করবে?'

'তুমি যা করাবে'।

'ছোটদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসো?'

'মিশন পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। ভালো গুরুর কাছে আসন, ধ্যান, প্রাণায়াম করেছি। ছোটদের নিয়ে ভারত ভ্রমণ করেছি।'

'যথেষ্ট, যথেষ্ট, চাকরি পাকা। এখন আমরা গোল হয়ে ছুটবো। মাঠটাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করবো। দম আছে, না ফুরিয়ে গেছে?'

'আছে।'

ভোরের রোদ। ভারী নরম। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস। অন্ধকারের মোড়ক খুলে ঝকঝকে একটা দিন বেরিয়ে এসেছে। প্রতিদিন কার নবজন্ম হয়? দিনের। আমরা সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দৌড়চ্ছি। আমি নয় আমরা। আমির সবচেয়ে আপনজন আমরা। হঠাৎ দেখি গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে ছুটছেন।

ব্রজদা একটা কাণ্ড করেছেন বটে। ছোটদের জন্যে সর্বাধুনিক একটি স্কুল। সন্ন্যাসী সেই স্কুলের পরিচালক। এই সন্ন্যাসীর ইতিহাস খুব অদ্ভুত। তরুণ এক সন্ন্যাসী কাশীর গঙ্গার ধারে বসে নিত্য ধ্যান-জপ করেন। উদাস মুখে তাকিয়ে

থাকেন আকাশের দিকে ; যেন মাটির এই পৃথিবীতে কিছু নেই। ধরা শূন্য, অধরাই পূর্ণ। ব্রজদা তখন পদ্মকে নিয়ে কাশীতে। পদ্মর মা সবে মারা গেছেন। ব্রজদা রোজই সন্ন্যাসীকে দেখেন। সুন্দর তরুণ শরীর। ফেরার দিন স্টেশন যাওয়ার সময় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সন্ন্যাসীকে হাত ধরে তুললেন। একটিই কথা— 'নর-নারায়ণের সেবা না করলে নারায়ণকে পাওয়া যায় না। এ কথা স্বামীজীর। চলো চলো। অনেক কাজ পড়ে আছে এই পৃথিবীতে, যা করা হয়নি।'

ব্রজদার ঐ জ্যোতির্ময় চেহারা, যা দেখে আমিও আকৃষ্ট হয়েছিলুম, পাশে অসাধারণ সুন্দরী পদ্ম। সন্ন্যাসী ভাবমগ্ন। অনেকদিন মৌনী। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। সিদ্ধিলাভ হল না কি? সম্মোহিত। গুটি গুটি ট্রেনে উঠলেন। দণ্ড-কমণ্ডলু পড়ে রইল কাশীর ঘাটে। বাবা বিশ্বেশ্বর, মা বিশ্বেশ্বরীর জিম্মায়। বাবা ব্রজেশ্বরের হ্যাঁচকা টানে ব্রজধামে। যেখানে শ্রীমতী পদ্ম ট্র্যাকস্যুট পরে সাদা মাঠে ছুটে বেড়ায় রোজ সকালে। একটি গোপালের কি ভাগ্য। বসে আছে, কাঁধের দু-পাশে ঝুলছে গোল গোল দুটি পা। পেছনে নাচতে নাচতে ছুটছে আরো একদল গোপাল। কাশীর পবিত্রানন্দের নবজন্ম। বাঙালি শরীর। কলকাতার মেধাবী ছাত্র। সংসারের হালচাল দেখে ডিগ্রি-ডিপ্লোমা বিসর্জন দিয়ে চলে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। গুরু বলেছিলেন, গুহায় ঢুকে চোখ বুজিয়ে বসে থাক। ও নীচের দিকে যা হচ্ছে হয়ে যাক। ও সব ভগবান বুঝবেন। চোখ খুলো না, শ্বাস নিয়ো না। ব্রজদা একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন—'চোখ খোলো, খুব জোরে জোরে শ্বাস নাও।'

পবিত্রানন্দের সঙ্গে একটা গাছের তলায় বসে কথা বলছি। ইতিমধ্যে তিনি আমাকে সব দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের এক একজন বিখ্যাত কারুশিল্পগুরু এসেছেন। তাঁদের একটি এলাকা। সর্বত্র আশ্রমের পরিবেশ। পর্ণকুটির। দাওয়া। অঙ্গন। বেড়া-ঘেরা ছোট্ট বাগান। বড় একটি গাছের ছায়া। পরিবেশ যেন অনুচ্চারে বলছে, 'শান্তি শান্তি।' ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কুটির নির্মাণের বিশিষ্ট এক একটি ধরন। ত্রিপুরায় এক রকম, গুজরাটে আর এক রকম, বিহার, বাংলা, ওড়িশা। সেইভাবেই সব তৈরি। কেন্দ্রস্থলে বিরাট ওয়ার্কশপ—সেটি আধুনিক—যেখানে একসঙ্গে অনেক ছেলে-মেয়ে কাজ শিখবে, কাজ করবে। তাদের তৈরি সুন্দর সুন্দর জিনিস দেশে-বিদেশে বিক্রি হবে।

আর একদিকে তন্তুবায় পল্লী। সেখানেও দেশ-বিদেশের কায়দা, বুনোন,

নক্সার পরীক্ষা-নিরীক্ষা-শিক্ষাদান। বাউলদের কয়েকটি কুটির। ছবির মতো একটি পুকুর। বড় বড় গাছ। পায়ে চলা পথ। পথের শেষে আখড়া। ওই দিকে আরো অনেক গ্রাম। সে-সব ব্রজদার এলাকার বাইরে। ইংরেজ আমলে অবশ্য এঁদেরই জমিদারিতে ছিল। বংশানুক্রমে স্থানীয় মানুষ এঁদের রাজাবাবুই বলে আসছেন, যদিও বংশে আর ক'জনই বা অবশিষ্ট আছেন।

বাউল পল্লীতে শ্রীনাথ বাউল স্থায়ীভাবে আছেন সপরিবারে। পণ্ডিত মানুষ। ছিলেন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়। বীরভূমে বাড়ি। শুধু গান নয়, বাউল দর্শনে মজে গিয়ে বংশের ধারা ছেড়ে যৌবনেই গৃহত্যাগ করেন। বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কুসুম বৈরাগীর কাছে আশ্রয় নেন। বার তিনেক বিদেশ গেছেন। দারুণ ইংরিজি লেখেন। বিদেশি ভক্তের সংখ্যা অনেক। বিভিন্ন জেলার বাউলরা যে-কোনো সময় এখানে আসতে পারেন, যতদিন খুশি থাকতে পারেন। আর গ্রামবাংলার মানুষ এখনো যাত্রা ও পল্লীগীতির ভক্ত। মাঠ ভরে যায়। ভারী সহজ সরল মানুষ। হাসি হাসি মুখ। গেরুয়া আলখাল্লা পরলেও সঙ্গে থাকেন সঙ্গিনী। মধুর রস। ভোরবেলা শ্রীনাথজী যোগে থাকেন। পরে কথা হবে। শুনলুম কয়েকদিন পরে উৎসব হবে। অনেক বাউল আসবেন।

এখানে কয়েকজন পটশিল্পী আছেন। পুরাণের কাহিনি তাঁদের পটে ফুটে ওঠে। রঙের কি অসাধারণ ব্যবহার! এক ঝলকের দেখা। এখন মনে হচ্ছে হঠাৎ এসে ভালোই করেছি ; কিন্তু কোন অধিকারে থাকবো। আমার তো দেবার কিছুই নেই। আবার কিছু কেনার মতো অর্থও নেই। দুটো সম্বল আমার—বাঁচা আর মরা। আমি একটা সুইচ—'অন', 'অফ'। ঈশ্বরের আঙুল। এই 'অন' করে দিলুম। বাল্ব জ্বলল। যেমন তোমার ওয়াট—চল্লিশ, ষাট, একশো, পাঁচশো—সেইরকম আলো। যেই 'অফ' করে দেবো, অন্ধকার।

।।পাঁচ।।

পদ্মকে অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলুম না। মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি ছুটতে ছুটতে আসছে। বসেছিলুম একা একা। একটা দাওয়া। কুটিরের দরজা, জানলা সব বন্ধ। কেউ নেই। পদ্ম এসে আমার হাতটা ধরে বললে, 'ওঠো, ওঠো, অনেক কবিতা লিখলে, এইবার ব্রেকফাস্ট।'

'দুপুরবেলা এই ঘরটায় আমাকে থাকতে হবে?'

'আজ্ঞে না। দুপুরে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। অনেক অনেক কাজ। আমার সঙ্গে তুমি গ্রামে যাবে। নিজের চোখে দেখবে মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকে। তবু

হাসে, তবু গান গায়, একতারা হাতে নাচে। একটা ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, বছর বছর ছেলেমেয়ে আসে। মেয়েরা একটু বড় হলেই পাচার। মুম্বাই, দুবাই, দিল্লি, পাঞ্জাব। ছেলেরা কোথায় গিয়ে জীবন শেষ করবে কেউ জানে না। যদি কেউ লেখাপড়া শেখে গ্রাম ছেড়ে পালাবে। সে তখন বড়া আদমি।'

'আমাদের ভূমিকা?'

'ছেঁড়া জীবনে তাপ্পি মারা। ষোল বছরের মেয়ে গর্ভবতী। শরীরে রক্ত নেই। সাদা। শাশুড়ীর অত্যাচার। স্বামীর কাজ নেশা-ভাঙ, বউ পেটানো। লরির পেছনে বাণী— 'মেরা ভারত মহান।' কোটিপতি এলিয়ে পড়ছে। যুবশক্তি নাইট ক্লাবে 'ডাক-মেয়েদের' সঙ্গে আমেরিকান নাচ নাচছে। ড্রাগ মাফিদের হাতঝোলায় পাউডারের পুরিয়া। না, আর বলব না। বলে কি হবে। কিছু করার থাকলে করো। আর তা না হলে চুপ করো।'

'বিশাল সমস্যা পদ্ম। এইসব দেখতে দেখতে, ভূতের নৃত্যের সাক্ষী হতে হতে বয়েস গড়িয়ে গেল অনেকটা। ভীষণ অসহায় লাগে।'

'আমি কি ভাবি জানো? তোমার হাতে আছে একটা টর্চ, যতটুকু জায়গা আলোকিত হয় ততটুকুই হোক।'

এক জায়গায় পট-শিল্পীরা সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পট আঁকতে বসেছেন। রঙের ব্যবহার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। একসময় গুণী এক শিল্পীর কাছে কিছুদিন ছবি আঁকা শিখেছিলুম। রঙ আর রেখার প্রেমে পড়ে। এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই নিজের আনন্দে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। আমি ওমুকের মতো হব, আমি তমুকের মতো হব। কেন? আমি আমার মতো হব। তিনটে রঙের খেলা—লাল, নীল, হলুদ। কি সব আত্মবিশ্বাস। তুলির এক এক টানে রেখা কখনো সোজা, কখনো বাঁকা। রামায়ণের দৃশ্য। দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

পদ্ম হাতে হালকা টান মেরে বললে, 'এখন দাঁড়ালে চলবে না। একদিন অনেকটা সময় থেকো। আজ অনেক কাজ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইকেলে চেপে দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম। রোদ বেশ চড়া। মাঝে মাঝে এক এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। দূরে সুবর্ণরেখা। পথে চড়াই-উতরাই। পদ্মর সাইকেল আগে, আমারটা পেছনে। দুটো সাইকেলই নতুন। বেশ শক্তপোক্ত। চালাতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। দু'জনেরই পেছনে দুটো বাক্স। জীবনের ছোটখাটো প্রয়োজনে লাগে, এমন সব জিনিসে ভরা।

রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য খুব সুন্দর। একটা-দুটো বাড়ি। পাঁচিল-ঘেরা পুরনো বাগান। পরিত্যক্ত একটা গড়। নবাবদের আমলের। মোগল-পাঠান যুদ্ধের

স্মৃতি। জায়গাটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার। বড় বড় বেজি। সাপ তো থাকবেই। ময়াল সাপ থাকাও বিচিত্র নয়। কটর কটর করে কি একটা পাখি ডেকেই চলেছে।

এইখানে একটা চালার সামনে পদ্ম সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। ছোট্ট কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বেশ একটা শান্তি। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। সাদা চুল, দাড়ি, শক্তসমর্থ। খুব সুন্দর। পদ্ম বললে, 'ফাদার! হাউ আর ইউ।'

'ফাইন, ফাইন।'

আমাকে দেখছেন। পদ্ম বললে, 'আমাদের নতুন কর্মী। আবার লেখক, ভাবুক, একেবারে অন্যরকমের ছেলে। আমার খুব ভালো লেগেছে। ওরও ভালো লেগেছে।'

আমরা ভেতরে ঢুকলুম। পেছন দিকে বিরাট ব্যাপার। ভদ্রলোক মাছের বিজ্ঞানী। মাছ নিয়ে গবেষণা চলেছে। হাইব্রিড তৈরি করছেন। সুবর্ণরেখার জলে তৈরি হয়েছে জলাধার। রকম রকম মাছ মহানন্দে খেলা করছে। বিজ্ঞানী বললেন, 'চাঁদের আলোর রাতে আসবে, লেখার খোরাক পাবে।'

জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ে। গড়ের ধ্বংসস্তূপ। যুদ্ধের জায়গা। ভেতরে কামান-টামান থাকতে পারে। মাটির তলায় নরকঙ্কাল। ভদ্রলোক চা তৈরি করছিলেন। আমাদের দিলেন। নিজেই রান্না করেন। মাছ নিয়ে গবেষণা করলেও নিজে মাছ খান না। দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। পদ্ম এক কথায় রাজি। ভদ্রলোক ছোট্ট একটা বেকারি করেছেন। রুটি, বিস্কুট তৈরি করেন। পাঁউরুটি তৈরির সুন্দর একটা গন্ধ আছে। ভদ্রলোক গোয়ানিজ, খ্রিস্টান। সামনের ঘরে উঁচু বেদির ওপর খ্রিস্টের মূর্তি। পেছনে ক্রশ। সামনে ঝকঝকে বাতিদান। বাঁধানো বাইবেল। সর্বত্র একটা পবিত্রতা।

সাইকেলে উঠতে গিয়ে পদ্ম কিছু একটা ভেবে বললে, 'না, পিছুটান রাখা যাবে না। আমরা তো স্বাধীন। আজ দুপুরে আমরা কোথায় কখন খাবো, আমরা কি জানি? তুমি জানো?

'আমি কোন কিছুই জানি না।'

'কে জানে?'

'আমার পদ্ম জানে।'

'ঠিক বলছ?'

'আমি খোশামোদ করতে শিখিনি ; কারণ আমি একা। মরে গেলে আমার জন্যে কেউ শোক করবে না। শ্রাদ্ধ করবে না। ছিল, নেই। কি পড়ে আছে? ছাই।'

'বাব্বা! ছেলের অভিমান দেখো! এই ব্যাটা। আমার কে আছে রে?'

পদ্ম ভেতরে ঢুকে কি সব বলে বেরিয়ে এল।

চলল সাইকেল গড়গড়িয়ে। বিরাট বিরাট মাঠ। এখানে-ওখানে ছোট-বড় কালো কালো পাথর পড়ে আছে। এই সকালবেলাতেও জায়গাটা কেমন যেন থমথমে, ছমছমে। এমন কিছু জোরে বাতাস বইছে না, তাও কেমন একটা সিঁ সিঁ শব্দ। এপাশে-ওপাশে ঘাসফুল ফুটে আছে। পাশাপাশি দুটো পাথরের খাঁজে মোটা একটা হাড়। কেউ যেন যত্ন করে সাজিয়ে রেখে গেছে।

পদ্ম সাইকেল থেকে নামতে নামতে বললে, 'নেমে পড়ো। এই জায়গাটা একটু উপভোগ করি। মানুষ এখানে আসতে ভয় পায়। এই মাটির দেশে এত পাথর কোথা থেকে এল?'

আমরা পাশাপাশি দুটো পাথরে বসলুম। জায়গায় জায়গায় ঘাস গজিয়েছে। ছোট ছোট নাকছাবি ফুল। হালকা নীল। ছোট ছোট ঘোড়া ফড়িং ছিট ছিট করে লাফাচ্ছে। আকাশটা যেন কত উঁচুতে। পদ্ম বললে, 'রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করছিলেন সেই সময় হনুমান আকাশপথে বিভিন্ন দিক থেকে পাথর আনছিলেন। এইখানে কিছু পাথর আকাশ থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'সেই ত্রেতাযুগ থেকে পড়ে আছে?'

'মানুষের বিশ্বাস।'

'তুলে নিয়ে যায় না কেন?'

'সে চেষ্টা কি আর হয়নি। তোলা অসম্ভব। এদের শেকড় অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে। সব ক'টাই এক একটা ছোটোখাটো পাহাড়। কেমন লাগছে?'

'মনে কেমন কেমন সব চিন্তা আসছে।'

'আমাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে?'

'করছে।'

'একালের না সেকালের?'

'দ্বাপরের।'

'তুমি একেবারে অন্যরকম।'

'যাঃ, সব জন্তুই একরকম।'

'মেয়েরা বুঝতে পারে।'

'ভুলও করে।'

'তুমি গাছে উঠতে পারো?'

'পারি।'

'সাঁতার?'
'জানি।'
'ছবি আঁকা?'
'মোটামুটি। গুরুর কাছে শিখেছি।'
'গান?'
'শিখেছি, তবে চর্চা নেই।'
'মারামারি?'
'একেবারেই আনাড়ি।'
'ব্যায়াম?'
'আসন।'
'রান্না?'
'খুব ভালো। লোকে বলে।'
'মিথ্যে কথা?'
'অভ্যাস নেই।'
'কোনো মেয়েকে আগে ভালোবেসেছ?'
'না।'
'কেন?'
'সুযোগ পাইনি।'
'ভয়ে?'
'বলতে পারো।'
'ভয়ের কারণ?'
'টেঁকসই নয়।'
'আর একটু পরিস্কার।'
'বাহারি ফিনফিনে কাচের গেলাস। পড়ে গেলেই চুরমার। আর পড়বেই।'
'কেউ নেই কেন?'
'মৃত্যু।'
'কি নিয়ে বেঁচে আছ?'
'স্মৃতি নিয়ে।'
'এখানে থাকবে?'
'যদি নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারি।'

'কার কাছে?'
'তোমার কাছে।'
'আমি কে?'
'তুমিই সব। তুমিই প্রাণ।'
'একজন ভোগাচ্ছে।'
'পবিত্রানন্দ?'
'কি করে বুঝলে?'
'বুঝতে পারি।'
'তোমাকে পাশে চাই।'
'আরো কয়েকদিন দেখো।'
'আমি একটা মেয়ে।'
'আমিও একটা ছেলে।'
'তাহলে চলো।'

।। ছয় ।।

ভূত, প্রেত, অলৌকিক ঘটনা আমি বিশ্বাস করি না। আবার এমনও বলি না বিজ্ঞানই সব। কাল মাঝরাতে দেখেছি আমার ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে দুটো পা চলে যাচ্ছে। শরীরটা থাকলেও অদৃশ্য। পা দুটো পদ্মর ঘরে ঢুকল। খুবই অস্বস্তিকর দৃশ্য। ঠিক সেই সময় কোথাও কিছু পড়ে যাবার শব্দ হল। কিছুক্ষণের জন্যে শরীর অবশ। পদ্ম আমাকে ডাকছে। শুনছি, কিন্তু অবশ। পা দুটোর একটা আমার বিছানায় ওঠার চেষ্টা করছে। আমি কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি না। শুধু ভাবছি, আজই আমার জীবনের শেষ রাত নয় তো! আমার বালিশে আমার মাথার পাশেই কেউ বুঝি মাথা রাখলে, অদৃশ্য! কিন্তু বুঝতে পারছি। এও বুঝতে পারছি— কোনো মহিলা। আমি তলিয়ে যাচ্ছি। যেন উঁচু আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছি। একটা পাথরের মতো।

ভোর। পদ্ম আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে—'কি হয়েছে তোমার? কেমন একটা শব্দ করছিলে অনেকক্ষণ ধরে?'

অনেকক্ষণ লাগল বুঝতে—কোথায় আছি আমি। একেবারে বিছানায় এসে। সম্পর্কহীন মহিলা যদি ঘনিষ্ঠ হয় অস্বস্তি লাগে। সংক্ষিপ্ত পোশাক, মুখ ধোয়া হয়নি। কেমন যেন একটা লজ্জার ব্যাপার। রাতের ঘটনা প্রকাশ না করে বললুম—'মনে হয় স্বপ্ন দেখছিলুম।'

পদ্ম হাসল। বোধহয় বুঝতে পারল—আমি চেপে যাচ্ছি।

আকাশের গায়ে অন্ধকার তখন লেগে আছে শ্যাওলার মতো। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে কাল রাতে। জিজ্ঞেস করলুম—'কাল রাতে কোনো সময় তুমি আমাকে ডেকেছিলে?'

'হয়তো। বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলুম।'

দূরে একটা উঁচু জায়গায় সিদ্ধেশ্বর বসে আছে। মানুষটা রাতে ঘুমোতে পারে না—বৃথা চেষ্টাও করে না। ওর আঠার বছরের মেয়েটা আজ একমাস হল নিরুদ্দেশ। সুন্দরী মেয়ে। অনেক চেষ্টা করেছে। কোনো ফল হয়নি। এদিককার বেশ কয়েকটি মেয়ে পরপর অদৃশ্য হয়ে গেছে রহস্যজনক ভাবে। এদিকটায় নারী পাচার চক্র তৎপর হয়েছে। দেশের শাসন প্রায় ভেঙে পড়েছে। একদল ঘুমোচ্ছে। সময়মতো টাকা এসে যাচ্ছে। আরো ওপরে যারা—পদাধিকারী—তারা দেখেও দেখছে না—না জানার ভান করছে। কেউ দেখতে চাইলে, তার চোখে ঠুলি পরিয়ে দিচ্ছে। ব্যবসা নষ্ট করো না। রাজনীতি এখন বোলবোলা ব্যবসা। ফর্মুলা—দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনবে না। পাওনাটা বুঝে নেবে—গাওনাটা হবে—সব সময় তোমাদের পাশে আছি।

সিদ্ধেশ্বর এই ধরনের কথা বলতে আর ভয় পায় না। মেরে ফেলবে? মরার বাকিটা কি আছে। আমি সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সিদ্ধেশ্বরের চেয়েও অসহায়। একদল মানুষের তাণ্ডব চলেছে। দেখতে দেখতে এসে পড়েছি—যেন একটা দ্বীপে। আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি ; কিন্তু অসংগঠিত। সাহস থাকলে হবে না, সংখ্যা চাই। শুধু সংখ্যায় হবে না। দল চাই, বাহিনী চাই, অস্ত্র-শস্ত্রও চাই। যুদ্ধ করতে হবে। নতুন ধরনের যুদ্ধ।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, 'তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ, না থাকতে?'

'এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসিনি।'

'বয়েসটা কম। এই বয়সের মানুষ ভাবুক হয়।'

'তা হয়।'

'তোমার থাকতে ইচ্ছে করবে। তবে কি জান এই বাড়িটার সঙ্গে কোনো একটা অভিশাপ জড়িয়ে আছে। কেউ সুখী হয় না। শিক্ষিত জমিদার। আর পাঁচটা অশিক্ষিত জমিদারের মতো মামলা-মোকদ্দমা করে শেষ হয়নি। পদ্ম বিলেতে লেখাপড়া করলেও মেমসাহেব হয়ে ফেরেনি।'

'বিলেতে লেখাপড়া?'

'তোমায় বলেনি?'

'না।'

'এইটাই ওর গুণ। এই জন্যেই সবাই ওকে এত মানে, ভালোবাসে। আবার ভয় পায়। একসময় ও এখানে ঘোড়া ছোটাত। ঠিক যেন ঝাঁসির রানি।'

'আমি আপনার পরিচয় জানি না। তবে আপনার দুঃখের কথা জানি।'

'সব মানুষেরই পরিচয় থাকে—সে মানুষ। এই পরিচয় কেউ জানতে চাইবে না কারণ দেখতেই তো পাচ্ছে। পরিচয় মানে—সে কি করে? আমি ঘরামি। তবে একটু অন্যরকম। চালা-বাড়ি নিয়ে খেলা করি। পৃথিবীটা খুব অদ্ভুত। এই বিষয়েও গবেষণা হয়। মহাভারত, রামায়ণের কালে কি হত, রেড ইন্ডিয়ানরা কোথায় কি ভাবে থাকত। কত রকমের ঘর আছে। পুরাতত্ত্বের মধ্যেই পড়ে। এই কারণে আমি তিনবার বিদেশ ভ্রমণ করেছি।'

'আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি। কি সহজ, সরল, সাধারণ আপনি।'

'ভাই পৃথিবীটা বিশাল বড়। এখানে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। সবাই সমান। অহংকারের কোনো দাম নেই। পদ্ম যে কত বড় বোটানিস্ট দেখলে বোঝা যায়? বিলিতি ডিগ্রি। ব্রজদা গ্লাসগোর ইঞ্জিনিয়ার। এরা নিজেরা কিছু বলে! কোনো অহংকার দেখায়? কোনো ঠাটবাট! আমি এদের কাছে পড়ে আছি এই একটি মাত্র কারণে। এরা একটা কিছু করতে চাইছে। আমি সেই কাজের সহযোগী। আমার মেয়েটাকে কেউ অপহরণ করেনি বলেই মনে হয়। এটা রটনা। সে তার মায়ের কাছে চলে গেছে।'

'মা? আপনার স্ত্রী? এখানে নেই?'

'না। তার পক্ষে গ্রামে থাকা সম্ভব নয়। তার কাছে এসব পাগলামি।'

'আপনি খবর নিচ্ছেন না কেন?'

'সাউথ আফ্রিকা। কলোনিয়াল বৃটিশদের খুব অহংকার হয়। আবার ক্যাথলিক। বাবা পাদ্রি।'

'প্রেম হল?'

'তোমার কি মনে হয় আমি প্রেম করতে পারি? থাকতে থাকতে পরিচয়। সুন্দর পিয়ানো বাজাত। ভালো লিখত। দোষটা আমার। জীবন থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে খারাপ লাগে। বাড়ি ধসে যাওয়া। তোমাদের মতো কবি নই ; তবে সকলেই এক একটি কবিতা। মাঝে মাঝে ভাবি, পৃথিবীকে ছেড়ে চাঁদ যখন বেরিয়ে গেল পৃথিবী হয়ে গেল দুঃখে সবুজ। জীবনে ঢুকে গেল মৃত্যু। আর চাঁদ তুলে ধরল মৃত্যু-শীতল মরা আলো—কফিনের চাদর। ভরা চাঁদের আলোয় পাহাড় নদীর কিনারায় গিয়ে বসবে মাঝরাতে—শুনতে পাবে চাঁদের চাদরের তলায় বসে পৃথিবী কবিতা লিখছে।'

'আপনি এইভাবে বসে থাকলে কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না।'

'নিজেকে চেনানোর খুব দরকার আছে? নিজেকে আগে নিজে চেন। তাহলে সবাই তোমাকে এক কথায় চিনতে পারবে। এ অভিনেতা নয়, রকম

রকম নয়, এক রকম। আর তুমি যদি মন্দিরের চূড়ার মতো আকাশের গায়ে নিঃসঙ্গ হতে চাও, তাহলে বিশেষ বিশিষ্ট হও। অনেক উঁচুতে একটি ধ্বজা।'

দূর থেকে কয়েকজন প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছেন আমাদের দিকে। কিছু একটা হয়েছে বুঝি। একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সিদ্ধেশ্বরদা শিগ্‌গির চলুন, আপনার মেয়ে মাকে নিয়ে ফিরে এসেছে।'

সিদ্ধেশ্বরদার বাড়িটা আহিতি দ্বীপের মানুষরা যে ধরনের বাড়িতে থাকে সেই আদলে তৈরি। এত সুন্দর বাড়ি আগে কখনো দেখিনি। একটা ভিড় জমে গেছে। পদ্ম যেন আনন্দে নাচছে। মা আর মেয়ে দু'জনে বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে হাসি হাসি মুখে। দু'জনের গলায় ঝুলছে করবীর মালা। সাঁওতাল পল্লীর একটা দল এসে গেছে তাদের বাদ্যবাজনা নিয়ে। এরা যেন সব উৎসব আর আনন্দ দিয়েই তৈরি। এদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে—জীবনের দুঃখ-কষ্টকে কিভাবে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয় এরাই জানে। আমার অনেক বন্ধু সাঁওতাল। দিনের পর দিন এদের পরিবারে থেকেছি।

সাদা একটা অ্যামবাসাডার আসছে। ধীরে ধীরে। গাড়িটা আমাদের সামনে থামল। আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য। নামলেন ব্রজদা। হাসছেন। পরিষ্কার চেহারা। কোথাও কোনো রোগের লক্ষণ নেই। সবাই আনন্দে শব্দ করে উঠলেন। সকলের প্রাণের মানুষ। একটা উৎসব তৈরি হল।

ব্রজদা বলছেন, 'পণ্ডিচেরীতে গিয়ে দেখি জেনিফার ঘুরছে। জেনিফারকে আমরা 'জনা' করে নিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি নীলাকে খবর পাঠালুম। কারোকে না বলে স্রেফ চলে আয়। বড় একটা কাজ আছে। ট্রেনে নয় প্লেনে। ওকে তো আমি কোলে-পিঠে মানুষ করেছি। আমি আবার ওর বন্ধু। তোমরা ভাবলে, ওকে ধরে নিয়ে গেছে। তা যাই ভাবো। আমি ভাঙা সংসার জুড়তে চাই। তা দেখলুম, জেনিফার বেশ বদলে গেছে। বুঝেছে, ভেসে বেড়ানোয় সুখ নেই। আশ্রয় চাই, ছায়া চাই, ভালোবাসা চাই, হাসি চাই, কান্না চাই, নদীর পাথর সিংহাসনে শালগ্রাম। মান থাকলেই অভিমান থাকবে। আমাদের আজকের এই সকাল—অন্য সকাল। আজ উৎসব। সারাদিন উৎসব। বীরভূম থেকে বাউলের দল এসেছেন। আজ আমরা সকলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করব।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো আছি, বেশ আছি।'

ব্রজদা আমাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে তাঁর নিভৃত আস্তানার দিকে এগিয়ে চললেন। ছোট্ট, কিন্তু সুন্দর। কোথাও বাড়তি কিছু নেই; যতটুকু প্রয়োজন। পেছন দিকে চারপাশ বাঁধানো একটি পদ্মপুকুর। জানলা খুলে দিলে বহুদূরে দৃষ্টি চলে যায় সবুজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

ব্রজদা বললেন, 'বোসো, অভদ্রতা করে ফেলেছি। এসে দেখলে আমি নেই ইচ্ছে করে।'

'মানে?'

'আমি ছিলুম। অদৃশ্য। তোমাকে আড়াল থেকে দেখছিলুম।'

'কেন?'

'তোমাকে দেখার যেটুকু বাকি ছিল দেখে নিলুম। খাঁটি না মেকি।'

'কি দেখলেন, কেনই বা দেখলেন?'

'এই চিঠিটা পড়ো।'

শ্রদ্ধেয় ব্রজদা,

আমাকে কাশী থেকে তুলে এনে গুরুদায়িত্ব দিলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম—সংসার ত্যাগ করলেও, ইন্দ্রিয় আমাকে ত্যাগ করেনি। কামনা-বাসনা-নারীর আকর্ষণ। দূরে থাকলে বোঝা যায় না। প্রলোভনের মধ্যে থাকলে বোঝা যায়। ব্যক্তিত্ব দ্বিখণ্ডিত হলেই মানুষ পাপের পথে পা বাড়ায়। সে চুরমার হয়ে যায়। তার ভেতরটা পড়ে ঝুলকালি হয়ে যায়। আপনার আহ্বানে যে যুবকটি এসেছে, তার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। আপনার পরিকল্পনা তার মাধ্যমে বাস্তব হবে। আমি প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে চাই বলেই হিমালয়ে চললুম। আপনি অসাধারণ মানুষ। আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা রইল। আমার স্মৃতিতে থাকবেন চির উজ্জ্বল।

—পবিত্রানন্দ।

জিজ্ঞেস করলুম, 'ব্যাপারটা কি হল?'

'সে চলে গেছে। আজ ভোরে।'

'কেন? কারণটা কি? চিঠিটা কে দিয়ে গেল আপনাকে?'

'স্কুলের দারোয়ান। তুমি লেখক, কারণটা তুমি বের করতে পারো।'

'হয় তো। এমনও হতে পারে, আমি আগেই পেরেছি। এমনও হতে পারে আমিই সেই কারণ।'

'কি বলছ? তুমি কি করে কারণ হতে পার!'

'আমার আর পবিত্রানন্দের মাঝখানে একটি নারীকে রাখুন। তা হলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।'

'কে সেই নারী?'

'আপনি জানেন। পদ্ম। পদ্মকে সে চেয়েছিল। সাহস করে বলতে পারেনি ; কারণ সে ভেকধারী সন্ন্যাসী।'

'তোমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার কারণ?'

'কারণ, আমি সহজ, কোনো কিছুতেই আমার কোনো কারণ নেই। আমি বোধহয় অসুস্থ।'

'অসুস্থ? কি তোমার অসুখ?'

'আমার কাম নেই।'

'প্রেম আছে তো?'

উত্তর দেওয়া হল না। ঝড়ের বেগে পদ্ম ঢুকল ঘরে, 'তুমি ব্রজধামে ঢুকে বসে আছ, আর আমি তোমাকে কোথায় না কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই দেখ, আমার কনুইটা ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে— তোমার জন্যে, তোমার জন্যে, তোমার জন্যে।'

সাদা মোমে লাল কুমকুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি করে হল? চলো চলো ড্রেসিং দরকার।'

'ড্রেসিং দরকার। কে করবে?'

'আমি করব।'

'জ্বালা করবে?'

'একটু। বুঝতে পারবে না।'

ব্রজদা বললেন, 'ভেতরের ঘরে সব ব্যবস্থা আছে। কি করে এতটা থেঁতো করলি?'

পদ্ম একগাল হেসে বললে, 'করে ফেললুম। ওর মুখটা দেখো— যেন আমার নয়, ওর কনুই কেটেছে। তোমার বারাণসী সন্ন্যাসী হাওয়া হয়ে গেছে।'

ভেতরের ঘরে গুম গুম করে আমার বুকে ঘুষি মারতে মারতে বললে— 'সকাল থেকে, সকাল থেকে এই মুখটা আমি একবারও দেখিনি। কেন? কেন?'

সব হয়ে গেল। ব্যান্ড এড লাগিয়ে দিলুম, 'ইশ। কি করে করলে?'

'একটা বাচ্চা ইট ছুঁড়ছিল। তখন তার মুখটা যেমন হয়েছিল, এখন তোমার মুখটা সেই রকম হয়েছে।'

দুপুরবেলা খাবার ঘরে ব্রজদা বারান্দার একপাশে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'মেয়েটার জীবন খুব দুঃখের, ওকে আর আহত কোরো না। বাইরের ক্ষতের মতো ভেতরের ক্ষতটাও ড্রেস করে দিও। না হয় আর একজনের জন্যেই বাঁচলে। ও তো সেই দিনই মরে যেত। এক সেন্টিমিটারের জন্যে বেঁচে গেছে। হয়তো ওর জীবনে তুমি আসবে বলে। পবিত্র! আমি তো আর বেশিদিন নেই। তোমরা সুখী হও, খুব সুখী। কোথায় গেল সে?'

'পরিবেশন করছে, আমিও চললুম পরিবেশনে। আপনি বসুন। দেখুন, খাবার ঘর আজ গমগম করছে।'

মগজি

কত চরিত্র হাত দিয়ে উতরে গেল। উত্তম-মধ্যম-কিছু অধমের আনাগোনা। এই দরজায় ঢুকে মূল মঞ্চে প্রবেশ করে খানিকক্ষণ টিকে অদৃশ্য হওয়া। কপাল ভাল থাকলে কিংবা আঙুল নিসপিস করলে ফিরে আসার সবুজ সংকেত। নতুবা যে হেঁচকি তোলে সে কোন আক্কেলে স্বপ্ন দেখে।

'হে-জীবন বিচ্ছিন্নের
সমুদ্রে সমুদ্রে নিরাকার
ঢেউগুলি নিরুদ্দেশ নির্বিশেষ
কোথায় সীমানা।
কার কোথা তীর কোথা তল
কোথা দ্বীপ নেই জানা—
এলোমেলো সব ছবি
মানুষের অসহায়তার।'

আহা স্বপ্নই তো সব গো। এটা পচা গন্ধ ছাড়লে সে দুঃখ বুঝে বাজে বেশি। আধো আধো তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্ন মই বেয়ে উপরে উঠে চলেছে। ওঠো বলছি ওঠো আরও ওঠো থামতে পারবে না, বিশ্রাম? হাঃ হাঃ হাঃ এ আবার কী শব্দ, নেই নেই অভিধানে নেই, থাকলে তলারটা উঠে এসে সাপ-লুডো খেলে দেবে। পোক্কা। স্বপ্নের খোসা ছাড়িয়ে ওটাকে ক্যাডাভারাস রূপ দিয়ে কী পেলে বাপ। পৃথিবীতে কত স্বপ্ন আছে তার খবর রাখো? সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে জন্মাচ্ছে, মরছে, ধারাবাহিক প্রক্রিয়াস্বরূপ, শরীরচর্চার মতো স্বপ্নচর্চা, তাগড়াই হলে ভরসা, ঝট করে কেউ পটকে দিতে পারবে না। থেকে যাবে।

ওহে মানুষ খুঁজতে থাক হন্যে হয়ে। ঘরে-বাইরে মানুষের কারবার, জীবন বিছিয়ে ফেললেই হল, এপারে টর্চ মারো ওপারে উত্তর পাবে, কুইক রেসপন্স তুমি আছ আমি আছি সবাই মিলে সবাই আছি, বিশাল চওড়া রাজপথের জীবন, চলমান জীবন। একা? কথাটাই ভিত্তিহীন, যা হয় না তা নিয়ে মিথ্যার বেসাতি করে আত্মপ্রসাদ মিলতে পারে, যুক্তি খাটে না। পানসে লাগে। এক কে গুটিয়ে রাখলে একা, তাহলে তো হয়েই গেল, এগনো-পিছনো দুই বন্ধ, জীবন খাঁ খাঁ পিপাসার্ত এক। সব থেকেও কেঁচো। বুঝে নাও বন্ধ জীবন নিয়ে ফাজলামো ভাল লাগে না। জীবনের লণ্ঠন এক হাত থেকে বহু হাতে।

তেড়েফুঁড়ে বাঁচার মন্ত্র গাও দেখি ভাই জীবনের অর্থ শিল্পীর তুলির টানে সম্পূর্ণতায় রূপ নেবে।

কত চরিত্রের ঠাস বুনোনে জন্ম নিল উপন্যাস। দেশ-সমাজ-আন্তর্জাতিকতার প্রতিফলন। অনেকটা দেখনদারি চমৎকারিত্ব প্রকাশের অন্তিম একমুঠো যতি চিহ্ন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন, উপলব্ধি যাঁর যাঁর তাঁর তাঁর। শেষ হয়? সেও থাক নামে নামে নামধারীর জিম্মায়। আমি পদবী সমন্বিত অমুক বলি শেষের শেষ নেই, শেষ থেকে শুরু, জীবন যেখানে এসে নেমেছিল মোড় ঘুরে অন্য পথ বাছবে, সে বড় মজার ব্যাপার। ডালপালা ছাঁটলে কী আর ঘাড়বাড়ন্তের গোড়ায় কুড়ুল মারা যায়, জীবন বহু জীবনে খেলে বেড়াবে, রসদ রাখবে কারোর যদি কাঁচিয়ে নেওয়ার শখ হয় নেবে। ভবিষ্যৎ লুঠে নেবে কোন শক্তি?

একটা নাম দুটো নাম তিনটে পাস—নাম, নাম প্রয়োজনের তুলনায় ফাউ নাম। নাম সর্বস্ব জীবন। নাম কচলালে অমৃত-গরল দুই-ই ওঠে। দুটোরই আবার প্রতিভা আছে। গরলে কান্টিভেট করে প্রতিভা মিলল? হাউ ফানি। কত কিলো মজা সওদা করলেন ভায়া? যাই করুন পড়ে ফেনাটাই সর হবে আঙুল চুষতে চুষতে বছর কাবার। গরলের প্লাবন বীজ বুনতে বুনতে চলে। অমৃতের সন্ধানে। অমৃতের স্বাদ গরলের ঝাঁকুনিতে আরও জমাট বাঁধে। মুহূর্তে ছবি বদলে ফেলছে, পিছিয়ে দিচ্ছে, মাটিতে পেড়ে ফেলে কসরত দেখিয়ে ফের স্বাবলম্বী করছে। এও হিম্মত বৈকি। অমৃত বরং ডরপুক, অথবা দাম বাড়ানোর প্রয়াস। চেখে দেখো বেশি খেও না। সইয়ে-সইয়ে।

ভাবনার সামনে পাঁচিল তুলতে হবে। নইলে কোথায় কোন দাঁড়ে গিয়ে বসবে হদিশ মেলা ভার। ইচ্ছাপূরণ করার জন্য কোন এক নামের অধিকারী এক ব্যক্তি তাঁর লেখার টেবিলে এসে বলেছেন, চিন্তার ধোঁয়ায় চোখ জ্বললেও দৃষ্টি ঝাপসা হলে খোঁজা বড় দুষ্কর। কী খোঁজায় ব্যস্ত ভাই? চরিত্রের। প্রলাপ বকছো, এ আবার কী বদখেয়াল। না, না দীর্ঘদিন ভাবনার গোড়ায় জল দিয়ে তাকে মার্জিত ছেঁটে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি। এক একটা ভাবনা এক একটা রূপের খোলসে ঢুকে পড়ে হাঁটবে চলবে ব্যবহার করবে। সমাজে সামাজিক আদব-কায়দায় গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। পূর্ণতা মিলবে এমন নিশ্চয়তা নেই, ছিদ্র থাকবেই, এবং সেখান দিয়েই ঘাটতির নোনা জল ঢুকে চোখ টাটাবে। ফাঁক থাকলে আলোচনা সমালোচনা অন্য চরিত্রের বিষয়ের খোরাক হবে। কাহিনি চলবে এগিয়ে।

যে ব্যক্তি টেবিলের সামনে চেয়ারে সেঁটে কলমদানির ডটপেন নাড়াচাড়ায় সন্ত্রস্ত, কোন খোপে কোন ভাবনা কতটা পরিমাণ ঢুকলে মানানসই হবে, সমাজে অসামাজিক হয়ে উঠবে না তারই খচখচানি। ব্যক্তি ধন্দে নাক টানছে। বাড়তি অক্সিজেন হলে ভাল হয়। বেশ চলছিল আবার ধন্দ উৎপাত জুটলো কোথ্থেকে। ব্যক্তি আসামি, ব্যক্তি ভাবছে ব্যক্তির ভাবনা একটা তা টুকরো টুকরো হলে কতখানি কার্যকারী হয়ে উঠবে, সে থাকলেও তাই নিয়ে ঝুঁকি অবশ্যই ঝুঁকি, সৃষ্টির ফলাফল উত্তরণ বা অবতরণ। এর বেশি আসবেই না।

তবে আর আঙুলে জড়তা কোন যুক্তিতে। উপাদান হাজির, নেমে পড়ো ভাবনার নবজীবনের মহাসমুদ্রে। জল খাও জল খাও, হাত-পা ছুঁড়তে থাকো, সাঁতার শিখে ফেলে ডাঙায় উঠে সার্থকতা পাও চরিত্র আকছা আকছিতে। ফেলে রাখলে ওই পড়েই থাকবে। ব্যক্তি বলছেন—বিরক্তি ঝেড়ে ফেলে ফুটবল পায়ে নেমে পড়, কাদা মেখে উঠে ফিসফিসিয়ে বলা চাই আ...মী... মা...ং...সিত...গোল সময়ে হবে।

বড় মামা বললেন, 'সবাই নতুন বাড়ি কেনে, আমি একটা পুরনো বাড়ি কিনব। সন্ধানে সেরকম কোনও বাড়ি আছে?'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'পুরনো বাড়ি কত আছে। গঙ্গার ধারে দাঁয়েদের বাড়ি। বিক্রি করতে চাইছে। নীচের আর উপরের মিলিয়ে আটখানা ঘর। ছাদে চিলেকোঠা। সারিয়ে সুরিয়ে নিলে অনেকদিন চলবে।'

জগন্নাথবাবু জমি, বাড়ির দালালি করেন। অম্বল আর আলসারের রোগী। বড়মামার কাছে প্রায়ই আসেন চিকিৎসার জন্যে।

ওষুধের কিছু ফ্রি স্যাম্পেল দিতে দিতে বলেন, 'ধুস, ও পুরনো বাড়ি নয়, আমি চাইছি সাবেককালের কোনও জমিদারের ভাঙা বাড়ি। বট, অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে গিয়েছে। এপাশ ওপাশ ধসে পড়ে গিয়েছে। সিঁড়ির কিছুটা আছে, কিছুটা নেই। বড় বড় খিলান। অলিন্দ যেতে যেতে ঢুকে গিয়েছে ধ্বংস স্তূপে। একটা, দুটো ঘর ঠিক আছে, বাকিগুলোর ছাদ মেঝেতে নেমে এসেছে। চারপাশে ঝোপঝাপ, আগাছা। পাঁচিলে সাপের খোলস। চিলেকোঠায় বাদুড় ঝুলছে। ভাঙা ঘরে পূর্বপুরুষদের অয়েল পেন্টিং ঝুলছে। কোনও ঘরে পড়ে আছে ভাঙা সোফা। একপাশে পড়ে আছে শুকনো দুপাটি জুতো। কোনও ঘরে এক তাক বই। হাত দিয়ে টানলে ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়বে। পাতাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়বে। ঠাকুর ঘরে ফাটল ধরা বেদিতে মা দুর্গার পট ধুলো পড়ে ঝাপসা। সিঁদুরের টিপটা একই আছে। উপুড় করা

পেতলের ঘটি। একটা ঘন্টা। কালো হয়ে গেছে। দেওয়ালে ঘড়ির খাঁচা। পেন্ডুলামটা খুলে পড়ে আছে। খাটের উপর ছাদ ভেঙে পড়েছে। রান্নাঘরের একটা দিক নেই। পর পর কটা উনুন পড়ে আছে। দেওয়ালে তেলচিটে কালির দাগ। পেরেকে একটা সসপ্যান ঝুলছে। ঠিক এইরকম একটা বাড়ি চাই।'

'টেলিভিশন সিরিয়াল করবেন বুঝি? টিভিতে আজকাল খুব ভূত হচ্ছে।'

'সিরিয়াল টিরিয়াল নয়। এইরকম একটা বাড়ি সন্ধানে থাকলে বলবেন। আমি কিনব। রাত্তির বেলা মাদুর বগলে, হাতে জলের বোতল, সঙ্গে একটা টর্চ, মোটা একটা মোমবাতি আর দেশলাই নিয়ে, দোতলার যে ঘরটা মোটামুটি ভাল, সেই ঘরে শুতে যাব। সারা রাত চিত হয়ে পড়ে থাকব, চোখ দুটো ছানাবড়া। চারপাশে ভূতের দাপাদাপি। পূর্বপুরুষ জমিদার ইন্দ্র নারায়ণ, মাথায় সাদা পাগড়ি। পরনে চোগাচাপকান। পায়ে নাগরা। হাতে হাঙর মুখো ছড়ি। মাঝরাত্তিরে এসে বলবেন, একবার দেখ তো ডাক্তার বুকটা সব সময় এত ধড়ফড় করে কেন?'

জগন্নাথবাবু একটু সুযোগ পেয়ে বললেন, 'আমারও ওই একই অবস্থা। ভীষণ ধড়ফড় করে। কীরকম জানেন, আমি হাঁটছি, আর আমার হার্ট দৌড়চ্ছে। ধড়ফড়, ধড়ফড়।'

বড়মামা বললেন, 'ও কিছু না। ধড়টা পড়ে গেলেই প্রাণটা পরপর করে বেরিয়ে যাবে। বেরোতে পারছে না বলেই ধড়ফড়, ধড়ফড় করছে। এই তো? এই ওষুধটা দুবেলা খান না।'

এরপর হাত বাড়িয়ে ফ্রি স্যাম্পেলের ডিপো থেকে চার-পাঁচটা প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'লেটেস্ট। মনে হয় উপকার পাবেন। বাড়িটার কথা মনে রাখবেন। এই ওষুধটা খেলে আপনার যৌবন ফিরে আসবে। বাড়িটা যদি নদীর ধারে হয়, তাহলে তো কোনও কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে টাকা অ্যাডভান্স করে দেবেন। পিছন দিক দিয়ে একটা রাস্তা বের করিয়ে ভাঙাচোরা পাঁচিল পেরিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে যাবে নদীতে। দু-চারটে জেলে ডিঙি জলে দোল খাচ্ছে। কিছুটা দূরে জেলে গ্রাম। জাল শুকোচ্ছে রোদে। পরাণ মাঝি বসে আছে নদীর ধারে। মুখে একটা বিড়ি। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করবে, জমিদার বাড়িটা কিনলেন বুঝি। কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল সব। চোখের সামনে। আমি তার পাশে বসে পড়ে একটি বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরাব।'

—আপনি তো বিড়ি সিগারেট খান না?

—প্রথম টানটা মেরে ভীষণ কাশবো। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। দুজনে

বন্ধু হয়ে যাব। তার নাম হবে পরাণ মাঝি। একদিন জানতে পারব তার স্ত্রী খুব অসুস্থ। আমি তখন তার চালা বাড়িতে যাব। উঠোনে একটা সজনে গাছ। তার তলায় দড়ি ঝুলে যাওয়া একটা খাটিয়া। উঠোনটা খুব পরিষ্কার করে নিকোনো। চালের উপর লতিয়ে উঠেছে একটা চালকুমড়ো গাছ। সাতটা চালকুমড়ো এদিকে, ওদিকে শুয়ে আছে। রোদ পোহাচ্ছে। দুটো জবা গাছ। ফুলে ফুলে ভরে আছে। একটা লাল, আর একটা সাদা। দূরে দেখতে পাচ্ছি, উঁচু ব্লকওয়ালা শীতলা মন্দির আর বাবার মন্দির। বাবা পঞ্চানন। চৈত্রের শেষে চড়কের মেলা বসে।

জগন্নাথবাবু বললেন, 'আমার একটু কাজ আছে।'

বড়মামা পাত্তা দিলেন না। বললেন, 'থাক। এখনও প্রেসার দেখা হয়নি। একপাশে ছোট্ট একটা মাঠ। একদল বাচ্চা খেলা করছে। চিৎকার চেঁচামেচি। আমি ঘরে গেলুম। মিষ্টি একটা আলো। নদীর দিকের ছোট্ট জানালাটা খোলা। মিষ্টি হাওয়া আসছে। হাওয়ায় উড়ে আসছে নদী নদী গন্ধ। বাইরে চচ্চড়ে রোদ। নদীর জল ঝলসে ঝলসে উঠছে। ঘরের ভিতরে নীল আকাশের খেলা। সামান্য খাটে পরিষ্কার বিছানা। বিছানায় পরিষ্কার এক মহিলা। শুয়ে আছে। পায়ের উপর পরিষ্কার একটি চাদর দুভাঁজ করা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। যেন এক কিশোরী। খুবই সুন্দরী। দুচোখের কোণ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।'

—ডাক্তারবাবু, প্রায় বারোটা বেজে গেল।

—বাজুক। বারোটা বাজলে তবেই না এক আসবে। এখনও আপনার স্ত্রীর সুগার আর প্রেসারের ওষুধ দেওয়া হয়নি।

আমি দেখেই বললুম, 'এ কী করেছ পরাণ মাঝি? এ তো অ্যানিমিয়া। একটু একটু জ্বর হবে, হাত পা ফুলবে। দাঁড়াও দেখি আমার কাছে কী ওষুধ আছে? তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

পরাণকে নিয়ে আমার পোড়ো বাড়ির দোতলায় আসব। ভাঙা ফটো, মেঝেতে একটা মাদুর, একটা বালিশ, গায়ে দেওয়ার জন্য পাতলা একটা চাদর। বালিশের পাশে স্টেথিস্কোপটা দেখে পরাণ বললে, তুমি ডাক্তার নাকি? তুমি আমার কাছে বিড়ি চেয়ে খেলে! অবাক কাণ্ড যে!

একগাদা আয়রন ক্যাপসুল দিয়ে বললুম, 'বউকে নিয়ম করে খাওয়াও। আমি ব্লাড টেস্ট করাব।'

আপনি ডাক্তারবাবু!

'আপনি বললে ওষুধ কেড়ে নেব। তুমি, তুমি। আর আমার কী হল, তোমার গাছে অনেক কাগজি লেবু হয়েছে, দুটো দিয়ে যাবে।

ভাঙা ছাদের ঘরে তোলা উনুনে রান্না করব। স্বপাক। নদীতে স্নান করব।

জগন্নাথবাবু তড়াং করে লাফিয়ে উঠলেন। চেয়ারটা উল্টে পড়ে যায় আর কী? আর্তস্বরে বললেন, 'আর পারছি না, আর চেপে রাখতে পারছি না।' ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছেন।

বড়মামা হেঁকে বললেন, 'কোলাইটিস, কোলাইটিস। খুব ভাল ওষুধ বেরিয়েছে।'

আমার বড়মামা, সেও একটা সম্বর্ক। সকলের কাছে তাঁর পরিচয়, নাম করা এক ডাক্তার। মজার মানুষ। প্রেমিক মানুষ, দরদি মানুষ। অনেকে এমনও বলেন, ডাক্তার আমাদের ভগবান।

জগন্নাথবাবুর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর খুব মজার সম্পর্ক। জগন্নাথবাবুকে দেখলে মনে হবে সত্যযুগের মানুষ। সহজ, সরল। দেহটা বিরাট, মুখটা বালকের মতো। বড় বড় দুটো চোখ। চোখে সব সময় খেলা করে একটা হাসি হাসি ভাব। এত সরল, যে সকলের সব কথা বিশ্বাস করেন। পূর্বপুরুষরা খুব বড়লোক ছিলেন। অবস্থা পড়ে যাওয়ার পর, বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রি হতে লাগল। এই বিক্রি করতে করতে, জগন্নাথবাবু হয়ে গেলেন বাড়ি-জমির দালাল। একালে বলবে রিয়েল এস্টেটের বিজনেস। জগন্নাথবাবুর বর্তমান অবস্থা বেশ ভালই। পরিবার, পরিজন বড়লোকি চালে চললেও, জগন্নাথবাবু খুব সামান্য ভাবেই থাকেন। কথায় কথায় ডাক্তারকে বলেন, 'এক সময় দুবেলা জুটতো না। রাত্তিরবেলা প্রায় নো মিল, আমার কি লপচপানি চলে। একা ওদের সঙ্গে আমি পেরে উঠব না ডাক্তার। লোকে আগে ত্যাজ্য পুত্তুর করত, এই জেনারেশন ত্যাজ্য পিতা করে। আপনি সংসার করেননি, বেঁচে গিয়েছেন। এ যে কী কাল পড়েছে। আমারও বাড়ি ঢুকতে ভয় করে।'

চেম্বারে সকালের রাশ কেটে গেলে জগন্নাথবাবু একবার আসবেনই আসবেন। সেই সময় বড়মামা বিরাট এক গ্লাস চা নিয়ে বসেন। দুজনেই চায়ের ভক্ত। কম্পাউন্ডার বিশ্বনাথদা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গ্লাস এগিয়ে দেন।

বেলা ১টা। ডাক্তারদের সময় জ্ঞান থাকে না। আমাদের জগন্নাথবাবুও সেই দলেই পড়েন। ঢাউস দু-গ্লাস চা নিয়ে দুজনে বসেছেন, খেল, ভোর হল দোর খোল, খুকুমণি ওঠ রে।

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকে নাড়ির খবর কী!'

—সকালের দিকে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল।

—সে ভাল। ঘড়ি কিছুক্ষণ অফ করে রাখলে ব্যাটারি অনেকদিন চলে।

—নাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে তো মানুষ মারা যায়।

—ধুর, ও তো ডাক্তারদের ধারণা। সঙ্গে সঙ্গে ...
দেয়, লোকটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

—না পোড়ালে তো পচে দুর্গন্ধ ছাড়বে।

—নাও ছাড়তে পারে। সবাই কি আর সত্যি সত্যি ...
নেই। খাট এসে গেল, ফুল এসে গেল। কাঁধে তুলে ...
বল। ঢুকিয়ে দিল চুল্লিতে। চিৎকার করছে বেঁচে আছি, ...
কোনও শব্দই তো বাইরে আসবে না।

'আপনি মনে হয় ঠিক বলছেন। আমার এখনও মনে ...
যাননি।'

'কীরকম?'

'চিতায় তো শোয়ানো হল। আমাকে বলল মুখাগ্নি কর। ...
ঠোঁটে ঠেকাতে যাচ্ছি, স্পষ্ট শুনলুম বাবার গলা, আঃ। ...
হয়ে পড়ে গেলুম। পরে বিরোধী পক্ষেরা বলতে লাগল, ...
কথা আজই আপনাকে বললুম। কাউকে বলিনি।'

বড়মামা বললেন, 'পুরোপুরি মরা অত সহজ নয়। মৃত্যু ...
একটু একটু করে উপর দিকে ওঠে। মাথাটা অনেকক্ষণ ...
তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে দিলে কী করা যাবে।'

জগন্নাথবাবু মনে মনে কী একটা ভাবলেন, তারপর ...
'তাহলে পাঁচ ফুট লম্বা একটা লোকের চেয়ে ছয় ফুট লম্বা ...
মরতে একটু বেশি সময় লাগবে কারণ মৃত্যুর যাত্রা শুরু ...
হয় মাথায় উঠে।'

বড়মামা বললেন, 'অবশ্যই। অঙ্কের হিসেব। আমার ...

—আরে, আমি তো সেই কথাটাই বলতে এসেছি। ...
পেয়ে গিয়েছি। একেবারে গঙ্গার ধারে। বিলকুল ভাঙা। একেবারে ...
দোতলা ছিল। গঙ্গার দিকটা বসে নেমে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে ...
জলে নেমে যেতে পারবেন। একটা ঘর কোনওরকমে আছে।

—সাপ আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। থাকতে বাধ্য।

—ভেরি গুড। কী দাম বলছে?

—কেউ বেঁচে নেই, কে দাম বলবে।

—তাহলে আবার কী?

—স্রেফ গুঁতিয়ে ঢুকে যেতে হবে।

—এতদিন কেউ ঢোকেনি কেন?

—ভূতের ভয়ে। বাড়িটায় খুন হয়েছে, গলায় দড়ি হয়েছে। রান্না করতে করতে আগুনে পুড়ে মরেছে। বিউটিফুল, বিউটিফুল সব কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

—থাক ওটা যেমন আছে থাক। আমার জন্যে অন্য রকমের একটা বাড়ি দেখুন। তার আগে নাড়িটা দেখি।

অনেকক্ষণ ধরে কবজির কাছে তিন আঙুলের কসরত চলল, যেন সেতার বাজাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ টিপে থাকার পর বললেন, 'ধরে রেখেছেন কেন, ছেড়ে দিন।'

—পাচ্ছেন না বুঝি? পাবেন না। আমি নিজেও দেখেছি। মাঝে মধ্যে থাকে না।

—যোগসাধনা করেন বুঝি?

—প্রাণায়াম আর কুম্ভক।

—আই সি। যাক ভাবার কিছু নেই। যোগের বলে তৈলঙ্গস্বামী আড়াইশো বছর বেঁচে ছিলেন।

একজন রুগি এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটিএস নেওয়া আছে?'

ভদ্রলোকের নাম জানি না, তবে মুখ চেনা। ছোট একটা কারখানার মালিক।

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক আগে।'

—তাহলে নিতে হবে। ব্যান্ডেজ হয়েছে?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি বলার আগে জানলেন কী করে?'

—এইটুকু ভগবানের দান, আর বাকিটা শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা। আপনার হাঁটা আর মুখ দেখে বুঝেছি, পায়ে লেগেছে।

—আর বলবেন না, একেই বলে গ্রহ। আমারই সাইকেল আমার পায়ের উপর দাম করে পড়ে গেল।

—সুগার আছে?

—নরমালের চেয়ে সামান্য হাই।

বড়মামা টেবিলের উপর থেকে একটা টিউব ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'লাগাবেন।'

ভদ্রলোক ইঞ্জেকশন নিয়ে চলে যেতেই জগন্নাথবাবু বললেন, 'আপনাকে যত দেখি তত অবাক হই। আগের জন্মে ভগবান টগবান ছিলেন।'

—ভদ্রলোককে চেনেন? নিতাই বোস। এক সময় বিরাট ফুটবলার ছিলেন।

আবার চা এল। বেশ বড় রকমের একটা চুমুক মারলেন বড়মামা। জগন্নাথবাবু ধীর, শান্ত মানুষ। তাঁর ছোট ছোট চুমুক।

বড়মামা বললেন, 'আপনি গঙ্গার তীরে আমার জন্যে ছোট্ট কুঠিয়া টাইপের একটা বাড়ি খুঁজুন। অনেকদিন পড়ে আছে। রোদে, জলে, জানালা দরজা শুকিয়ে গিয়েছে। সাদাটে হয়ে গিয়েছে। চারপাশে বড় বড় ঘাস আর আগাছা। তারই মধ্যে বেঁচে আছে বয়স্ক একটি গন্ধরাজ, টগর, পেয়ারা আর জবা। গঙ্গার দিকে খোলা টানা একটা বারান্দা থাকবে। দুধাপ সিঁড়ি। নামলেই বড় বড় ঘাস। ভাঙাচোরা ইটপাতা পথ গঙ্গার দিকে চলে গিয়েছে। গড়িয়ে নেমে গিয়েছে গঙ্গার জলে। বেলা বারোটার পর থেকে দালানটা পশ্চিমের রোদে ভেসে যাবে। একপাশে থাকবে ছোট্ট মতো একটা রাঁধবার জায়গা। সেটা থাকবে দক্ষিণ দিকে। উত্তর দিকে ছোট্ট একটা বাথরুম। টিনের দরজা। পশ্চিমে ছোট্ট ঘুলঘুলি। দুপুরের চড়া রোদে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খটখটে। একটাই বড় ঘর। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সেই ঘরের মাঝখানে থাকবেন ঠাকুর, বড় একটা কাঠের সিংহাসনে। সেই ঘরেরই একপাশে কম্বল পেতে শোবার ব্যবস্থা।'

বড়মামা একটু দম নিলেন। এক চুমুকে চায়ের গ্লাস খালি। বললেন, 'যা যা বলছি, মনে থাকছে তো?'

জগন্নাথবাবু বললেন, 'ছবির মতো মনের পর্দায় আঁকা হয়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে শুনুন, আরও আছে। পাশে একটি ছোট্ট শিবমন্দির অবশ্যই থাকবে। বেশ উঁচু দালান দিয়ে ঘেরা। তিন দিকে তিনটে দরজা। প্রাচীন মন্দির। চূড়ায় মহাবীরের পতাকা। তামা দিয়ে তৈরি। যখন যেদিকে বাতাস বয়, সেদিকে ঘুরে যায়। মন্দিরের পাশেই বুক পর্যন্ত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা কুঠিয়া। খুব পুরনো। বাইরের দেওয়ালে শ্যাওলা ধরে গিয়েছে। মাঝারি মাপের দুটো মাত্র ঘর। সেকালের পালিশ করা লাল মেঝে বড় বড় ফাটল ধরেছে। ভিতরের দেওয়াল বিবর্ণ। পিছন দিকে একটা রক। অনেকটা জমি। সেখানে বিশাল একটা অশ্বত্থ গাছ। গঙ্গার বাতাসে সারাদিন গাছের পাতায় সিমসিম শব্দ। দুপুর একটায় একদল গাং শালিক কোথা থেকে উড়ে আসে।

মহা কলরব। কত কথা, কত গান। তাদের মাঝে একটু উপরের ডালে সুন্দরী বউ কথা কও। একা শান্তশিষ্ট। মাঝে মধ্যে ডাক ছাড়ে। যেন সুরের জিলিপি। পিছনের ওই জমিটা যেন একটা লন। তেমন ঘাস নেই, কিন্তু পরিষ্কার। ওই জমিটায় অশ্বত্থের ঝরাপাতা সারাদিন বাতাসের সঙ্গে খেলা করে। এক জোড়া কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি। দাওয়ার একপাশে সর্বক্ষণ থুপপি মেরে বসে থাকে মোটাসোটা লোমওয়ালা সাদা সুন্দরী একটি বিড়াল। কোনও লোভ নেই। বাড়তি কোনও চাহিদা নেই। পাশে কাঠবিড়ালি নির্ভয়ে এসে বসে থাকে। ঘাড়ে চেপে আদর করে। চড়াই পাখির ঝাঁক সামনে নাচ দেখায়। পুসি নির্বিকার।'

'ওই পবিত্র কুঠিয়ায় থাকেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। যার নাম আশুতোষ। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়। পাতলা, ঋজু, তেজস্বী। ধারাল মুখ, উন্নত নাসা, বড় বড় চোখ। চোখে সবসময় চাপা একটা হাসি আলোর মতো জ্বলে আছে। জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল। চুলে জটা ধরেছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে নাকে আসে চন্দনের গন্ধ। মন্দিরে রয়েছেন নকুলেশ্বর শিব। আশুতোষ পূজারি। তিনি সাধারণ পূজারি নন, সিদ্ধ সাধক। যৌবনেই ব্রাহ্মণী চলে গিয়েছেন একটি মাত্র মেয়েকে রেখে। নাম রেখেছিলেন গৌরী। সেই গৌরী আজ সন্ন্যাসিনী, সাধিকা। উত্তর ভারতে গৌরী মাঙ্গর নামে মানুষের ঢল নামে। মাঝে মধ্যে কখনও সখনও সাধিকা আসেন পিতার কাছে, জয় বাবা আশুতোষ। সঙ্গে কেউ থাকে না। একেবারে একা। হাতে ত্রিশূল। কাঁধে ঝুলি। গেরুয়া বসন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন সাধিকা, জয় বাবা আশুতোষ।

মা এসেছিস, মা এসেছিস। আশুতোষ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হাতে পেতলের ঘটি, কাঁধে পাট করা সাদা গামছা। পায়ে খড়ম। বোধহয় গঙ্গায় যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি ঘটিটা একপাশে রেখে, মেয়েকে হাত ধরে সাদরে তুলে আনলেন দাওয়ায়। ঘর থেকে কম্বল এনে বিছিয়ে দিলেন। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছি। কী রূপ। যেন আগুনের আভা। চোখ দুটো কী। মা দুর্গার চোখের চেয়েও বড়। একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। ভিতরে যা কিছু আবর্জনা ছিল সব ধক করে জ্বলে গেল।

অবাক হয়ে দেখছি, পিতা আশুতোষ ষষ্ঠাঙ্গে সাধিকা কন্যাকে প্রণাম করছেন। না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। পিতার দেওয়া শরীর ও সংস্কার সন্ন্যাস

নেওয়ার সময় হোমের আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এ অন্য শরীর, দেব শরীর। আমিও এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলুম। সাধিকা আমার মাথার পিছনে হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, ডাক্তারি ছেড় না বাবা, মানুষের উপকার হবে।

খুব অবাক হলুম, আমি যে ডাক্তার জানলেন কী করে। আরও অবাক হলুম, যখন বললেন, পূর্ব জন্মে তোমার নাম ছিল গঙ্গাধর। তুমি সাগরদ্বীপে কপিল মুনির আশ্রমে পূজারি ছিলে। তেতাল্লিশ বছর বয়সে তোমার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল, তোমার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এত সব জানলেন কী করে? জানা যায় নাকি? মানুষের পিছন দিকে কী ছিল, সামনে কী আছে। আমি প্রশ্ন করব না, আমি বিশ্বাস করব। একদিন যখন মরেই যেতে হবে, তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী মূল্য আছে। বিশ্বাসের জগতে কত কী আছে, অবিশ্বাসের জগতে কিছুই নেই।

বালতি নিয়ে গঙ্গায় জল আনতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ পিতা। আমি বালতিটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে তরতর করে নেমে যাব গঙ্গায়। জোয়ারের গঙ্গা। ভরা জল, টলটল। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। রোদ পড়ে জল যেন নীলাভ কাচ। অনেক ফুল ভেসে যাচ্ছে। তার মধ্যে পদ্মও আছে। শ্মশানের পোড়া কাঠও আছে। একটু আগে বড় কেউ চলে গেলেন। চিতার ফুল তাঁকেই অনুসরণ করে সাগরে চলেছে।

দাওয়ার একেবারে শেষ মাথায় পেরেকে ঝুলছে বাজারের ব্যাগ। সেইটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ব রাস্তায়। অন্যদিন বৃদ্ধ নিজেই বাজারে যান বেলা বারোটার সময়। তখন সব উঠে যাওয়ার সময়। যা পড়ে থাকে ব্যাপারিরা সস্তায় দিয়ে দেয়। এইরকম করেন কেন? মাথায় হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ বলেন, ডাক্তার বাবা। আমাকে যে আয় বুঝে চলতে হয়।

বাজার গমগম করছে। মানুষের টাকার গরমের ঝাঁজ বেরোচ্ছে। সকলেরই এক প্রশ্ন, ডাক্তারবাবু, আপনি বাজারে?

—আমি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছি।

—সে কী? তাহলে আমরা কার কাছে যাব? বুঝলেন জগন্নাথবাবু মানুষ আমাকে ভালবাসে।

এ কি গেল কোথায়?

চেয়ার খালি। জগন্নাথবাবু নেই।

কম্পাউন্ডারবাবু বললেন, 'পরপর দু-গ্লাস চা পড়েছে, আর বসে থাকতে পারেন। তির বেগে দৌড়েছেন।'

—আমি দেখতে পেলুম না কেন?

—আপনি ছিলেন না, মাঝে মধ্যেই আপনি থাকেন না।

—যাঃ, আমার বাজার করা হল না। আমার বৃদ্ধ পূজারি, সাধিকা অপেক্ষায় থাকবেন। আজ উপোষ!

কম্পাউন্ডারবাবু বললেন, জায়গাটা বলুন, আমি বাজার পৌঁছে দিয়ে আসছি।

—আরে সে কি আমি জানি। জানে জগন্নাথ। পালিয়ে গেল। এত বড় একটা লোক, ছেলেমানুষের মতো একটা পেট নিয়ে ঘুরছে।

বড়মামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খেলে কনস্টিপেশন হয় বলত?'

—মাংস।

—অ্যাই, ঠিক বলেছিস। দু-কেজি মাংস কিনে দিয়ে আয় তো।

কম্পাউন্ডারবাবু বললেন, 'ওরা বৈষ্ণব। মাংস ছোঁবেন না।'

—তাহলে কী হবে? মাংস নিরামিষ, মানে নিরামিষ মাংস কি আছে?

—এঁচোড়। এঁচোড়কে বলে গাছ পাঁঠা।

—এক জোড়া কাঁঠাল কিনে দিয়ে এস।

—এই শীতে কাঁঠাল মিলবে না, আর কাঁঠালেও পেট ছাড়বে।

—তাহলে বললে কেন?

—আমি এঁচোড় বলেছি।

—এঁচোড়ের অল্টারনেটিভ?

—কাঁচকলা।

—ভেরি গুড। দু-ডজন কাঁচকলা দিয়ে এস।

—কাঁচকলায় অনেকের অ্যালার্জি থাকে।

—থাকে থাকবে। দু-পাতা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট দিয়ে দাও।

ঠিক বেলা একটা। আমাদের বিখ্যাত জ্যোতিষী নিতাইবাবু এলেন। হয়ে গেল। বেলা চারটের আগে উঠবেন না। বাড়িশুদ্ধ সকলের উপোষ। আমি বড়মামার কানে কানে বললুম, 'মাসিমা বলেছেন দুটোর সময় খেতে বসতে হবে।'

—তুই বলে আয়, এ বেলা আমার নো মিল।

—বাঃ, আজকে কত ভাল ভাল রান্না হয়েছে। মাছের ডিমের বড়া। চিংড়ির মালাইকারি।

—কেন হয়েছে?

—আজ যে আপনার জন্মদিন।

—সে কী রে?

নিতাইবাবু বললেন, 'সেই জন্যই তো আমি এলুম। কুসি আমায় নিমন্ত্রণ করেছে।'

—তাহলে চলুন।

—আমাকে দুজন লোক দিন, মাকে নামাতে হবে।

—আপনার মা এসেছেন! কী সৌভাগ্য!

—শুধু আমার মা নয়, তিনি সকলের মা, জগন্মাতা।

একটু রহস্য রহস্য ঠেকল। আমরা হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এলুম। কোথায় মা? একটা ভ্যান গাড়ি, তার উপর একটা প্যাকিং বক্স। ছোটখাটো নয়, বেশ বড়।

বড়মামা বললেন, 'মাকে প্যাকিং বক্সে ভরে এনেছেন? বেঁচে আছেন তো?'

'বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব আপনার। আপনার সাধনায় মা জাগ্রত হবেন।'

বেজায় ভারী। আমরা ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে গেলুম। মাসিমা, গান্ধারী সবাই ছুটে এল। প্যাকিং বক্স খোলা মাত্রই আমরা সকলেই, আহা আহা করে উঠলুম। মা কালী। কী রূপ মায়ের।

আমাদের কম্পাউন্ডারবাবু ভীষণ ভক্ত মানুষ। তিনি কাঁদছেন।

বড়মামা হুংকার দিয়ে বললেন, 'মা আমার।'

নিতাইবাবু বলেন, 'অবশ্যই আপনার। জন্মদিনের উপহার।'

—মন্দির!

—মন্দির আপনাকে করতে হবে।

বড়মামা ভীষণ উত্তেজিত। আমাকে বললেন, 'বিকাশকে ফোন কর। এখুনি আসতে বল। এখানে আহার। জন্মদিন টন্মদিন বলবি না। এক গাদা উপহার নিয়ে চলে আসবে।'

আমাদের এই বিকাশদা বড় অদ্ভুত মানুষ। পাহাড়ের মতো চেহারা। বড়মামা নাম রেখেছেন বিকাশ মাউন্টেন। মাউন্টেন বলেই ডাকেন। সাজপোশাক পাঠানদের মতো। বিশাল গোঁফ-দাড়ি। লটকা লটকা চুল। স্বপ্নমাখা ঢুলু ঢুলু দুটো চোখ। হা হা করে যখন হাসেন ঘরের দরজা, জানলা কেঁপে ওঠে। চেহারা অনুযায়ী গলাটাও সেরকম ভারি মেঘ গর্জনের মতো। লম্বায় ছ-ফুট, দু-ইঞ্চি। বড়মামা বলেন, 'আর বেড়ো না। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। হার্ট বেচারা বিপদে পড়ে যাবে। তুমি কি ইউরিয়া খাও?' হাইব্রিড

মুলোর মতো চেহারা। হাতের আঙুলগুলো বরবটির মতো লম্বা লম্বা। নাকটা খাঁড়ার মতো খাড়া। দাঁতগুলো ঝকঝকে মুক্তোর মতো।

পাঞ্জাবির দু-পকেটে বোঝাই থাকে লজেন্স। নিজে খান না। শিশুদের বিতরণ করেন। ছোট্ট একটা গাড়ি আছে। ভোক্স ওয়াগেন। জার্মান-কার। চকোলেট রঙের। ঝকঝকে নতুন। নিজেই চালান। অত বড় একটা মানুষ যখন স্টিয়ারিং ধরে গাড়িতে বসেন তখন মনে হয় গাড়ি নয়, একটা মানুষ আসছে গড় গড় করে।

মানুষটা যেমন বড় মনটাও সেইরকম বড়। রাজ পরিবারের ছেলে। পিতামহ হাতির পিঠে চেপে পাশে সাহেব বসিয়ে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে শিকারে যেতেন। সেকালে বলা হতো শিকার খেলা। শিকার যত না হতো তার চেয়েও বেশি হতো আমোদ ফুর্তি। নিরাপদ জায়গায় তাঁবু ফেলা হতো। তাঁবুতে থাকবে মেম সাহেবরা। আর তাঁদের পোষা বিলিতি কুকুর। বলা হতো ল্যাপ ডগ। আদুরে কুকুর। সরু সরু গলা। সামান্য বিরক্তিতেই খাঁই খাঁই ডাক। তাবুর বাইরে সবুজ মাঠ। উঁচু উঁচু নীল পাহাড় দিয়ে ঘেরা। গা বেয়ে উঠে গিয়েছে ভেড়ার পিঠের লোমের মতো কোঁকড়া কোঁকড়া জঙ্গল। পথ ধরে নেমে আসছে পাহাড়ি ঝর্ণা। পাথরের খাঁজে খাঁজে। পাথুরে ঠোঁটে দুধের মতো ফেনা। ময়ূরের কর্কশ চিৎকার। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। হরিণের ডাক। বাক ডিয়ার। বড় বড় দুধরাজ পাখি। ঝোলা ঝোলা ন্যাজ। সাদা ধবধবে। গেরুয়া ঝুঁটি। ডাল থেকে ডালে উড়ে যাচ্ছে। রাগী রাগী টিয়া ঝাঁক নিয়ে ঘুরছে। শান্ত কালো ময়না গান গাইছে নিজের মনে। ঝর্ণা নিচে নেমে এসে ছোট্ট তরতরে নদী হয়েছে। কালো পাথরের দেওয়াল ঘেঁষে চলেছে। কোথাও কোথাও পাথরে আবদ্ধ হয়ে স্থির। যেন তরল কাচ। পাখিদের হামাম। বিকাশকাকু এলেই আমরা এই সব গল্প শুনতে পাই। সমানে গল্প চলতে চলতে রাত ভোর। তখন নড়ে চড়ে, এপাশে ওপাশে তাকিয়ে বুঝতে হয়, আছি কোথায়। বাড়িতে, না জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ে। হামাম কাকে বলে? বিকাশকাকু তখন আমাদের আরব দেশে নিয়ে যেতেন। হামাম মানে স্নানাগার, বড়লোকদের, বাদশা, বেগমদের চানঘর। মার্বেল পাথরের মেঝে, বড় বড় মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি চৌবাচ্চা। সাদা পাথর, নীল পাথর, গোলাপি পাথর। ঘরের ভিতরটা বাষ্পে আবছা হয়ে আছে। চৌবাচ্চা, চৌবাচ্চায় বিভিন্ন উষ্ণতার গরম জল। আতরের গন্ধ।

বিকাশকাকুর গল্প শুনতে শুনতে বড়মামার চোখ ক্রমশই বড় হতে থাকে।

যেন একটি শিশু। সবাই বলে, বড়দা আর বড় হল না। কথাটা মিথ্যে নয়। তাই মাসিমা বলেন, আমি দিদি নই, আমি ওর মা। গল্প শুনতে শুনতে মাসিমা, গান্ধারী, হরিদা, আমরা সবাই বিভোর হয়ে যাই।

সেই তাঁবুর বাইরে সবুজ ঘাসের উপর সাদা সাদা ক্যাম্প চেয়ার পাতা। মেম সাহেবরা সাদা সাদা গাউন পড়ে রাজহাঁসের মতো বসে থাকেন ঝলমলে রোদে। মাথার উপর ঝকঝকে নীল পাহাড়ি আকাশ। মেম সাহেবরা বসেবসে উল বোনেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা খেলা করে। তাঁবুর পিছন দিকে বাবুর্চিরা ভাল-মন্দ রান্নায় ব্যস্ত। একপাশে একঝাঁকা মুরগি গাদাগাদি হয়ে আছে। আর একদিকে সিক-কাবাব তৈরি হচ্ছে। পোড়া পোড়া গন্ধ। এক বালতি ঝর্ণার জলে একগাদা বিয়ারের বোতল শরীর ঠাণ্ডা করছে। সাহেবরা শিকার খেলে এসে কাবাবের টাকনা দিয়ে গেলাস গেলাস বিয়ার কোঁত কোঁত করে পান করবেন। তারপর বসবেন খানা টেবিলে। এলাহি আয়োজন। সেরা মদ! সেরা খাদ্য। বাস্কেটে স্তূপাকার আপেল, কলা, কালো আঙুরের থোকা।

ধীরে ধীরে রাত ঘনিয়ে আসবে। হাড় কাঁপানো বাতাস আসবে পাহাড়ের দিক থেকে। ঝর্ণার শব্দ আরও স্পষ্ট হবে। প্রত্যেকটি তাঁবুর বাইরে ঝোলানো হবে লণ্ঠন। চার কোণে বসে যাবে বন্দুক হাতে চারজন পাহারাদার। জঙ্গলে পশুরা রাতের উৎসবে জেগে উঠবে। কানে আসবে হায়নার হাসি, বাঘের গর্জন, উল্লুকের টিটকিরি। রকম রকম প্যাঁচার রকম রকম ডাক। যে তাঁবুটিকে বৈঠকখানা করা হয়েছে, সেখানে রাজ দরবারের সঙ্গীতজ্ঞরা ম্যান্ডোলিন বাজাবেন। কোনও কোনও মাতাল সাহেব হেঁড়ে গলায় প্রেমের গান ধরবেন।

রাতের খানায় আরও বিরাট আয়োজন। কাবাবের গন্ধ। হীরের মতো গেলাসে রক্তরাঙা মদ। এরপর রাত আরও গভীর হবে। জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে আসবে ঝিঁঝির ডাক। মাঝে মধ্যে নূপুরের শব্দ। রথী-মহারথীরা তখন নিদ্রার কোলে। লণ্ঠনরা তাকিয়ে থাকবে ভোরের দিকে। নিভু নিভু চুল্লির বুক থেকে মাঝে মধ্যে জোনাকির মতো ভেসে উঠবে চিটির পিটির আগুনের ফুলকি। একটাতে বসানো আছে বিরাট একটা কেটলি। সূর্যোদয়ের চায়ের জল। বিরাট একটা কালো সাপ বেড়াতে বেরিয়েছে। তাঁবুর বাইরে আগুনের বলয়। জলের দিকে চলেছে অসাবধানী শিকারের সন্ধানে।

বিকাশকাকু মায়ের মূর্তি দেখে মোহিত। ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম সেরে যখন উঠলেন, চোখে জল। মাতৃভক্ত। বললেন, কষ্ঠি পাথর। এ তো আনকোরা নতুন নয়। এই মা অনেকদিন পুজো পেয়েছেন।

নিতাইকাকু বললেন, আপনার চোখও সাংঘাতিক। ঠিক ধরেছেন। মা খুব অনাদরে ছিলেন। তাই আদরের জায়গায় নিয়ে এলুম। ডাক্তারের শনির দশা চলছে। শনির ইষ্ট দেবী কালী।

বড়মামা বললেন, শনির দশায় তো মানুষের খারাপ হয়।

—কে বলেছে? শনির মতো গ্রহ হয় না। শুদ্ধ, সত্ত্ব, সন্ন্যাসী, হার্মিট অফ দ্য স্কাই। অনন্তের পথে সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী। কৃচ্ছ্র সাধক। গ্রহরাজ। শনির জোরেই আপনি আজ এত জনপ্রিয় এক ডাক্তার। আপনার সব আছে, কিন্তু নিজে ভোগ করেন না কিছুই। নিজের ভাবেই থাকেন। আপনার ইষ্ট লাভ হবেই। শেষ কালে সাধক।

বড়মামা বললেন, 'বিকাশ একটা প্ল্যান বানাও। সুন্দর একটা পারিবারিক মন্দির। কালই নেমে পড়।'

মাসিমা বললেন, 'আমার অনেকদিনের ইচ্ছে। ভয়ে বলিনি। কে পুজো করবে? পুরোহিতের পুজো আমার ভাল লাগে না।'

বড়মামা বললেন, 'আমি করব।'

—তোমার সময় কোথায়?

—সময় বের করে নিতে হবে।

—এখন মাকে আমরা কোথায় রাখব?

—ঠাকুরঘরে সযত্নে। প্রতিষ্ঠার পর পুজো।

বিকাশকাকু বললেন, 'আমি তাহলে বেরিয়ে পড়ি। আমার টিম নিয়ে আসি।'

—দাঁড়াও, আজ আমার জন্মদিন। আমার বোন ভাল-মন্দ ভোজনের ব্যবস্থা করেছে।

—আজ তোমার জন্মদিন। আগে বলনি কেন? শুধু হাতে চলে এলুম। যাক, মন্দিরের মার্বেল-ফ্লোর আমার উপহার।

বিকাশকাকু মায়ের সামনে বসে পড়ে অদ্ভুত সুরে গান গাইতে লাগলেন, বোধহয় স্বরচিত।

মুণ্ডমালা উতারো মা
ম্যায় পুষ্পমালা লায়া হুঁ।।
শিউজিসে উতারো মা
মেরা শির পর চরণ রাখো মা।

ভক্ত মানুষ। গানের আবেগে আমরা কেমন যেন হয়ে গেলুম। ভরাট গলা। গলায় সুরের অভাব নেই। সকলকে মেঝেতে বসিয়ে দিয়েছেন।

দরজার বাইরে একটা মুখ দেখা গেল। বড়মামা বললেন, 'আসুন, আসুন, দেখুন, মা এসেছেন।' জগন্নাথবাবু ঘরে এলেন। প্রণাম করলেন। মুখটা ভার।

বড়মামা বললেন, 'কী হল? মুখ ভার কেন?'

—অন্যায় করে ফেলেছি। সাজাও পেয়েছি।

—কী অন্যায়?

—ওই যে, আপনার কথা শুনতে শুনতে উঠে পালালুম। এটা এক নম্বরের অসভ্যতা।

—আর সাজা কী পেলেন?

—বৃন্দাবনের দোকান পর্যন্ত গিয়েছি, ইলেকট্রিকের তারে বসেছিল একটা অসভ্য, ইললিটারেট কাক। সোজা ব্রহ্মতালুতে। কমপ্লিট চুনকাম। পরিষ্কার করব কী, হাত দিতে ঘেন্না করছে। শেষে কলের তলায় মাথাটা ফেললুম। বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। শেষে পরিবার গায়ে গঙ্গার জল ছিটিয়ে ঘরে তুললে। একে আমার সর্দির ধাত। হাঁচি হাঁচি পাচ্ছে। কী অলক্ষুণে ব্যাপার ঘটে গেল বলুন তো! একে শনিবার! কালী মন্দিরে পুজো দেব, ও মন্দির বন্ধ। সন্ধ্যেবেলা আরতি হয়, পুজো দেওয়া যাবে না।

বড়মামা বললেন, 'অত ভাববেন না তো! কাক মিনিটে মিনিটে ত্যাগ করে কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়াই। আপনার মাথাটা পাস করছিল পড়ে গিয়েছে, কী আর করা যাবে।'

—একজন বললে টাক পড়ে যাবে।

—সে অ্যামনেও পড়বে, অমনেও পড়বে। অত ভাববেন না।

—আমি কি আর ভাবছি, সবাই মিলে আমাকে ভাবাচ্ছে। একটু অ্যান্টি-বায়োটিক খেলে কেমন হয়?

—কী কারণে খাবেন?

—যদি কোনওরকম ইনফেকশন হয়।

নিতাইকাকু হাসতে হাসতে বললেন, 'ভয় নেই। আপনার কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনার বৃহস্পতি খুব ভালো জায়গায় আছে। আচমকা প্রচুর টাকা পাবেন। চাঁদের জন্য আপনার ঠান্ডা লাগার ধাতটা বরাবরই।'

জগন্নাথবাবু খুব সমীহ করে বললেন, 'ইনি কে?'

বড়মামা বললেন, 'সে কি! এই মহাপুরুষকে আপনি চেনেন না? ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী। নিত্যানন্দ জ্যোতিষার্ণব। কৃপা করে আসেন। কৃপা করে কয়েকদিন থাকেন। আমাদের যা যা বলেন, সব মিলে যায়।'

রবিবার। বড়মামার চেম্বার নেই। রোগেরও ছুটি। রুগিরও ছুটি। দোতলার হলঘরে বেশ বড় জমায়েত। জগন্নাথকাকু, বিকাশকাকু। আমাদের বাড়ির সবাই। পাড়ার আরও অনেকে। বিজ্ঞানের অধ্যাপক, গবেষক নৃপেনবাবু। বিজ্ঞান ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করেন না। ভুরু কুঁচকে বসে আছেন। সবার থেকে আলাদা। কথায় কথায় বলেন, কোয়ান্টাম থিয়োরি। নিতাই কাকুকে আজ দেখে নেবেন। বিজ্ঞানের শিলে ফেলে যুক্তির নোড়া দিয়ে থেঁতো করবেন।

বিকাশকাকু বড়বাজারের সেরা দোকান থেকে এক ঝাঁকা খাস্তা কচুরি এনেছেন। আজ বিরাট ব্যাপার। এক রাউন্ড চা হয়ে গিয়েছে। নিতাইকাকু নিজের জীবনের গল্প বলছেন। বাবা বললেন, 'নিতাই তোর বিয়ে দেব, মেয়েটি ভাল, পরিবার ভাল। একবার গিয়ে দেখে এস।'

—বিয়ে, বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। সারাটা জীবন একটা মেয়েকে ঘাড়ে নিয়ে ঘোরা! আমি কি ঘোড়া!

নৃপেনবাবু বললেন, 'ছি ছি নারীদের আপনি বোঝা ভাবেন? নারী হল শক্তি। শক্তি স্বরূপিনী। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরিতে শিব আর শক্তির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সর্বত্র ঝিমঝিম, বিনবিন, চিনচিন করে শক্তি কাঁপছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ বেরোচ্ছে তরঙ্গের আকারে। জন্ম, মৃত্যু, জন্ম ....।'

নিতাইকাকু বলেলন, 'স্টপ, স্টপ। আমি আমার জীবনের কথা বলছি। বিয়ের কথা শুনে মার চম্পট। সোজা বীরভূমে। সেখানে অট্টহাস বলে একটি শক্তি পীঠ আছে। কারও ক্ষমতা নেই আমাকে খুঁজে পায়, সমস্যা হল কোথায় থাকব? কী খাব? কুঠিয়ায় এক ভৈরবী। কী চেহারা। আগুন বেরোচ্ছে শরীর দিয়ে। চোখ দুটো যেন হোমের শিখা! ভয় আর ভক্তি দুটোই হল। ভৈরবী ইশারায় কাছে ডাকলেন, বেশ করেছিস পালিয়ে এসেছিস। বিয়ে তোর সহ্য হবে না।

খুব অবাক হয়ে গেলুম। কী করে জানলেন আমি পালিয়ে এসেছি। এরপরে যে কথাটি বললেন, শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। বললেন, পূর্ব জন্মে তুই আমার স্বামী ছিলিস, এই জন্মে তুই আমার ছেলে হবি।

বয়স এখন কম। একপাশে বিরাট শ্মশান। চিতা জ্বলছে। চিতার কাঁপা কাঁপা আগুনের পাশে, মাথায় ফেট্টি বাঁধা কালো কালো কটা ছায়ামূর্তি বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অসম্ভব নোংরা, শীর্ণ একটা নদী। নদীর

ওপাড়ে জঙ্গল, একপাল শিয়াল মাঝে মধ্যে ডেকে উঠছে। নদীর দিক থেকে রাতের জরি বাতাসে পচা পচা একটা গন্ধ ভেসে আসছে।

কুঠিয়ায় একটা প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে। ঘরের উত্তরের দেওয়াল ঘেঁষে টকটকে লাল তারা মায়ের মূর্তি। দেখলেই ভয় করে। তার উপর এই সব কথা।'

সাধিকা বললেন, 'আর যে পালাতে পারবি না। তোকে আমি বেঁধে ফেলেছি।'

আমি তখন কাঁদছি, 'তুমি কি আমায় বলি দেবে!'

মুচকি হেসে বললেন, 'অবশ্যই! তবে দেহটা থাকবে।'

হঠাৎ বললেন, এই মাটির কলসিটা নিয়ে ওই নদীটায় চলে যা। জল নিয়ে আয়, মায়ের ভোগ রান্না হবে।

বললুম, 'ও তো বিষাক্ত জল।'

সাধিকা বললেন, 'বিষ নিয়েই আমাদের কারবার।'

কলসি হাতে নদীর দিকে যাচ্ছি। চিতা নিভে গিয়েছে। ফিনফিন করে ধোঁয়া উঠছে। কুচকুচে কালো রাত। শবের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা চলে গিয়েছেন। শব ভাল করে দাহ করা হয় না। আধ পোড়া দেহ জলে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। বাকি কাজটা শেয়ালে করবে। সকালে শকুন আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে। প্রথমে ভীষণ ভয় করছিল, হঠাৎ খুব সাহস এসে গেল। সবচেয়ে সাংঘাতিক কী হতে পারে, মৃত্যু। মানুষ তো মরবেই। মরার জন্যই পৃথিবীতে আসা। মৃত্যু আস্বাদন করব বলেই এই জীবন। জল নিয়ে ফিরে এলুম, তখন আর ঘেন্নাও করছে না। অন্ধকারে কলসিতে কী ভরেছি জানি না। সাধিকা বললেন, 'ওই কলসির জল এই কলসিতে ঢাল।'

অবাক কাণ্ড। প্রদীপের আলোয় দেখছি, কাঁচের মতো জল এই কলসি থেকে ওই কলসিতে পড়ছে। বিশাল চেহারার একটি লোক ভূতের মতো দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। মনে হল কিরাত। সাধিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাংস এনেছিস?'

মাংস এনেছে। কাঠের উনুনে আগুন জ্বলল। সাধিকা মায়ের ভোগ রাঁধতে বসলেন। কী তার স্বাদ। রাতে যখন খেতে বসলুম, তখন মনে হল এমন সুস্বাদু ভোগ আগে কখনও খাইনি। সাধিকা বললেন, 'ওই কম্বলটা পেতে শুয়ে পড়। অনেকরকম শব্দ শুনতে পাবে, ভয় পেয়ো না।'

শুয়ে পড়লুম। তন্দ্রা, ঘুম, ঘুম, তন্দ্রা এইরকম চলতে লাগল। হঠাৎ চোখ

দুটো যেন ঝলসে গেল। ঘরে হাজার হাজার পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠেছে। পূজার আসনে সাধিকা বসে আছেন সোজা। সাধিকা কোথায়! বাঘছালের আসনে বাঘ ছাল পরে বসে আছেন স্বয়ং মহাদেব। বিরাট আলোর উৎস হল মহাদেবের ত্রিশূল। আমার শরীর অসাড় হয়ে গেল। অচেতন হইনি। কিন্তু পাথর। সে এক অদ্ভুত উপলব্ধি। পাষাণী অহল্যার মতো। পাথর কিন্তু চেতনা আছে। সব বুঝতে পারছে। কালের পর কাল চলে যাচ্ছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত। রামচন্দ্র এসেছেন, তাও বুঝতে পারছেন।

ভোর হয়ে গেল। সব জড়তা চলে গেল। বাইরে এসে দেখছি সাধিকা ফুল তুলছেন। দিনের বেলা অনেক ভক্ত আসতেন। আর আসতেন দুটি বধূ। সকালে মায়ের পূজা হতো খুব বড় করে। বড় করে ভোগ দেওয়া হতো। ওই দুটি বউ যা খাটতেন তা বলার নয়, যেন দশভূজা। আমার কাজ ছিল কাঠ কাটা। বহু দূরে একটা টিউবওয়েল ছিল, সেইখান থেকে জল বয়ে আনা। কিরাতের মতো ওই লোকটির নাম ছিল রাবণ। বড় ভাল মানুষ। সাধিকা মায়ের জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারত। বড় বড় গাছ একাই কেটে আনত জঙ্গল থেকে। মাঝে মধ্যে কুঠিয়ার ছাদে উঠে খড় বিছিয়ে দিত। চালের উপর লাউ গাছ লতিয়ে দিয়েছিল। বড় বড় লাউ হতো। নদী থেকে মাছ ধরে আনত।

একদিন আলো দেখলুম, মহাদেবের শুভ্রজ্যোতি। এর পরে দেখলুম কালীর কালো। সে যে কী ভয়ংকর। আলোর কোনও ওজন নেই, কালোর ওজন আছে। আলো পাউডারের মতো, পরাগের মতো। কালো আলকাতরার মতো, জমাট রক্তের মতো।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। অদ্ভুত শব্দ। যেন লোহার শেকল বাজছে। ভারী ভারী লোহার শেকল। চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলুম না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মাটির বহু গভীরে কবরে চলে গিয়েছি যেন। শ্বাস নিতে পারছি না। কনকনে ঠান্ডা। কানে কানে কে যেন বলছে, মৃত্যু, তুমি মরে যাচ্ছ। উঠে বসার চেষ্টা করলুম। পারলুম না। শেকলের শব্দ হল। কেঁদে ফেললুম, 'মা! এক বিন্দু আলো দেখাও।' স্থির জোনাকির মতো, দূর আকাশের তারার মতো, সেই ভয়ংকর অন্ধকারে এক বিন্দু আলো ফুটল। দেখি, মায়ের কালো কপালে তাঁর ত্রিনয়ন। টকটকে লাল মায়ের মূর্তি। নিরেট অন্ধকারে খোদাই করা। মা বলে জ্ঞান হারালুম।

ভোর হল। জ্ঞান ফিরে এল। সাধিকা মা ফুল তুলছেন, গান গাইছেন। আমি গিয়ে বললুম, 'মা! তুমি আমাকে এই সব দেখিও না। আমার ভয় করে, আমি

মরে যাব মা।' মা অদ্ভুত একটা কথা বললেন, 'না মরলে বাঁচবি কী করে! শেষ দর্শন বাকি আছে।'

অবশেষে সেই দর্শন হল। সে তো বলা যাবে না। কিছুই নেই। আপনারা ভাবার চেষ্টা করুন, ধারণা করার চেষ্টা করুন। কিচ্ছু নেই। কিছু থাকলে কিছু নেই, ধারণা করা যায়। আছে আর নেই, নেই আর আছে, এই দুটি মাত্রায় জগৎ বাঁধা। স্বামী বিবেকানন্দ একটি গানে বলার চেষ্টা করেছেন, নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর/ভাসে ব্যোমে ছায়া সম, ছবি বিশ্ব চরাচর/ তারপর? অত্যন্ত কঠিন পর্যায়, ধারণার লয়। অস্ফুট মন আকশে জগৎ সংসারে ভাসে, ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর। আমি মানে আমার অস্তিত্ব, আমার অহংকার আছে বলে তুমি আছ, একটা বিভেদ। আমি দেখছি তাই তোমাকে দেখাচ্ছো। আমার দর্পণে তুমি, তোমার দর্পণে আমি। এই জগৎ একটা আয়না। আয়নাটা ভেঙে গেলে কী আর রইল। এই যে ছায়া, সেই ছায়াদল আর থাকবে না। স্বামীজী লিখছেন, ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ। আমিটা অর্থাৎ অনুভূতিটা রয়েছে তখনও, চেতনা। শেষ অবস্থা। তারপর? সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইলো, অবাঙ্, মনসো গোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার। এই শূন্য এক মহাবিজ্ঞান। শূন্য আর অনন্ত এক। উপনিষদ সেই মহাবিজ্ঞানের কথা বলছেন, 'পূর্ণস্য পূর্ণম আদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতা' সংস্কৃতে পূর্ণম শব্দের দুটি অর্থ পূর্ণ এবং শূন্য। সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অনন্তকে পাওয়া যায়।

নৃপেনকাকু নড়ে চড়ে উঠলেন। হাতে কাগজ ছেঁড়ার ভঙ্গি করে বললেন, 'আমার কোয়ান্টাম এই আমি ছিঁড়ে ফেললুম। আজ থেকে আপনি আমার গুরু।'

নিতাইকাকু হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি গুরু হওয়ার জন্যে পৃথিবীতে আসনি। আমি চির শিষ্য। আরও একশোবার আসব শিষ্য হওয়ার জন্যে। কত জানার আছে। শেখার আছে। পদার্থ হয়ে অপদার্থ। পদার্থবিদ্যার কিছুই জানি না। এই যে আপনার কোয়ান্টাম, আমার জ্ঞানে কালী। শিব থেকে নির্গত শক্তি। কালো কেন? সাধক আলো করবে বলে। সেই অন্ধকারে প্রবেশ করে সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে জানবে। সাধকও তো বিজ্ঞানী। তবমৎ কোথায়? বিজ্ঞানী বলছে, আমি জানব। সাধক বলছে, কৃপা করে আমাকে জানাও। এই সৃষ্টিতে তুমি আছ, আলোতে আছ, অন্ধকারে আছ। জড়ে আছ, জীবনে আছ। তুমি নেই

তো, কিছুই নেই। সব কিছুই এখানে হচ্ছে, জন্ম হচ্ছে, মৃত্যুও হচ্ছে। এমনকী একটা পাথরের অস্তিত্বও পাথরে ঠাসা আছে। পৃথিবীতে দুটো শক্তি খেলা করছে, দেখার শক্তি আর দেখাবার শক্তি। এইটাই হল ক্ষেত্র, আপনাদের পরিভাষায় ফিল্ড। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ, বিভাগ যোগ সকলেরই পড়া উচিত। অর্জুন শ্রীভগবানের কাছে জানতে চাইছেন, কে কেশব। প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান আর জ্ঞেয় কী? আপনার পদার্থবিদ্যা বলছে, পদার্থ মানে শক্তি। ক্ষুদ্রতে ক্ষুদ্র শক্তি বৃহতে বৃহৎ। আর আপনাদের বিজ্ঞানী ডিরাক সাহেব বললেন, অণুর গঠনে শুধু ইলেকট্রন নয় পিছনে অনুরূপ আরও একটি পদার্থ আছে, যেটি হল পজিট্রন। দুটিতেই বিদুৎ শক্তি, ওটিতে নেগেটিভ, এটিতে পজেটিভ। দুয়ে মিলে নিউট্রাল, শান্তি। তা না হলে প্রতিটি বস্তুই আমাদের শক মারত। আমাদের শাস্ত্র এই অবস্থানকেই বলছেন পুরুষ আর প্রকৃতি। শিব আর কালী। সৃষ্টি। কালী শিবকে ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেই সংহার মূর্তি।

আমি তিন দিন ওই অবস্থায় পড়েছিলুম। দেহ আছে, প্রাণের লক্ষণ নেই! কিন্তু মৃত্যু নয়। চতুর্থ দিনে আমি ফিরে এলুম। কোথা থেকে এলুম বলতে পারব না। স্মৃতি সেখানে যায়নি। কে গিয়েছে, কী গিয়েছে, কে জানে। স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে মা অনেক আয়োজন করে রেখেছিলেন। ঘট, ঘটি, বাটি, গ্লাস, নুড়ি পাথর, বড় পাথর, সাদা কাপড়, নীল কাপড়, গেরুয়া কাপড়, ফুল, ফল—প্রথমেই যা চোখে পড়ল, লাঠি কাঁধে মাথায় পাগড়ি বাঁধা একটি লোক কোথায় চলেছে। ওই লোকটিকে ধরে আমার অস্তিত্ব বোধ ফিরে এল।'

নিতাইকাকু ঘড়ি দেখলেন, 'নাঃ অনেকটা বলেছি, অনেকক্ষণ বলেছি, আর না। এবার আমরা কচুরি খাব, চা খাব। রোজকার জীবনের কথা বলব।'

নৃপেনকাকু বললেন, 'শুধু এই কথাটা বলুন, গ্রহ-নক্ষত্র কী মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে! আপনি বিজ্ঞানী। আমি আর এক বিজ্ঞানীর কথা বলছি, নিউটন। জ্যোতিষে তাঁর ভীষণ বিশ্বাস ছিল। রয়াল সোসাইটির সদস্য বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন আপনি জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন? নিউটন চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন, আমি আপনাদের মতো বিশ্বে যা কিছু ঘটছে সবই অ্যাকসিডেন্ট, তা বিশ্বাস করতে রাজি নই, তাছাড়া শাস্ত্রটি আমি ভালভাবে পড়েছি, আপনারা পড়েননি।

অ্যাস্ট্রোলজি পৃথিবীর প্রাচীনতম শাস্ত্র। বহু বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, নাম করা

মানুষ জ্যোতিষ বিশ্বাস করতেন, করেন, করবেন। বিদেশি কয়েক জনের নাম বলি—চসার, দান্তে, শেক্সপিয়ার, ক্রমওয়েল, কোপারনিকাস, কেপলার, প্লেটো, বেকন। বিখ্যাত নস্ত্রাদামুসের সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণীই তো অ্যাস্ট্রোলজি নির্ভর।

চাঁদের উপাসনা থেকেই জ্যোতিষের জন্ম। ইতিহাসের আদিকাল। সভ্যতার আলো তখনও জ্বলেনি। দীর্ঘ রাত। সূর্যাস্তের পরেই অন্ধকার রাত। রহস্যময় চাদরের তলায় হারিয়ে গেল দিনের পৃথিবী। চতুর্দিকে গভীর অরণ্য। দীর্ঘ দীর্ঘ ঢেউয়ের লাইন টানা ভয়ংকর সমুদ্র। সারাদিন ফুঁসছে। যোজন ব্যাপী মরুভূমি। বালির ঢেউ। আকাশ ছোঁয়া পর্বতশৃঙ্গ। গড়িয়ে গড়িয়ে হিম ঠান্ডা নেমে আসছে শ্বেত ভল্লুকের মতো। দাঁতাল জানোয়ারদের দল তেড়ে আসছে। অসহায় মানুষ। প্রকৃতির উপর তখনও প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেনি। তখন সেই বর্বর মানুষের দল স্নিগ্ধ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত শুক্ল পক্ষের রাতে। এ কী শোভা! ছ-হাজার বছর আগের মানব চিত্র। মানুষ যত তার চেয়ে বেশি শ্বাপদের দল। মৃত্যুকে চারপাশে ছড়িয়ে রেখে বাঁচার চেষ্টা। মানুষ যত দেখছে তত দার্শনিক হচ্ছে, ভাবুক হচ্ছে। চাঁদই কারণ। মানুষ প্রথমে দার্শনিক, তারপর প্রযুক্তিবিদ, তারপর বিজ্ঞানী।

ইতিহাসের কাল আসবে অনেক পরে। তার আগে দলে দলে মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসছে, চলে যাচ্ছে। তারা অবাক হয়ে দেখছে। দিনের আকাশ, সূর্য। রাতের চন্দ্র। শীতল জ্যোৎস্না। অন্ধকার আকাশ পটে তারার শোভা! এ কী দুর্লঙ্ঘ নিয়মে জগৎ বাঁধা। উদয়, অস্ত। ঋতুচক্রের পরিবর্তন। রাতের দৈহিক নিষ্ক্রিয়তার অবসরে কল্পনা কাজ করছে। ওই যে তারা, দূর আকাশে তারামণ্ডল, ওদের এক একটা নাম রাখলে কেমন হয়। সেই জগতে পশুরাই প্রবল। মানুষ তখন পাশব দেবতারই উপাসনা করত। তাদের নামেই তারকারা পরিচিত হল।

পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচ্যের পুরোহিতরা এই আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র মণ্ডল, দর্শন ও প্রাকৃতিক নানা ঘটনা দেখে, লিখে, মিলিয়ে একটা সংযোগ খুঁজে পেলেন। অভ্রান্ত এক গণিত। তারই নাম অ্যাস্ট্রোলজি। নাঃ, আর না। দুটো খাস্তা কচুরিতে এত পোষায় না।

বিকাশকাকু বললেন, 'আর কী খাবেন বলুন?'

নিতাইকাকুর হাসি হাসি মুখ হঠাৎ খুব থমথমে হয়ে গেল। নৃপেনবাবুকে বললেন, 'আপনি এখন বাড়ি যান। ডাক্তার আপনিও সঙ্গে যান। ওষুধের ব্যাগ, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ যেন সঙ্গে থাকে।'

সারা ঘরে একটা ভয় নেমে এল। নৃপেনবাবু ঝট করে উঠে দাঁড়ানোর ফলেই বোধহয় টলে গেলেন। বড়মামা টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমাকে বললেন, 'চলে আয়।'

বড়মামা একবারই শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ কি অসুস্থ।'

নৃপেনকাকু বললেন, 'না তো!'

আমরা গেটের কাছ পর্যন্ত গিয়েছি, নৃপেনকাকুর মেয়ে মাধুরী তির বেগে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দেখেই ভেঙে পড়ল, 'মা নেই, মা আর নেই।'

মাসিমা বললেন, 'জ্যোতিষবাবু আপনি খুব সাংঘাতিক। যদি জানতেই পারলেন চলে যাচ্ছে টেনে রাখলেন না কেন, অমন দেবীর মতো মেয়েটি চলে গেল। যাওয়ার বয়স তো হয়নি।'

'দেখ একটু আগে, কয়েক দিন আগে জানতে পারলে হয়তো আমি টপকে দিতে পারতুম। যেভাবে মানুষ খানা, কী গভীর গর্ত টপকে যায়, সেইভাবে। সামান্য সময়ের পরিচয়। হঠাৎ যখন দেখতে পেলুম, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অনেকটা চলে গিয়েছেন ওদিকে। লোকালয়ে আমার আর থাকা উচিত নয়। আমি আমার জায়গায় ফিরে যাই।'

—সে হয় না, আমরা আপনাদের ছাড়ব না। আমাদের মন্দিরে মা বসবেন। আপনার সাধনপীঠ, চলে গেলেই হল। আমরা কার আদেশে চলব?

—তোমরা আমাকে এত ভালবাসো?

—শুধু ভালবাসা? তার সঙ্গে শ্রদ্ধা।

বড়মামা বিষণ্ণ মুখে ঘরে ঢুকে বললেন, আজ তৃতীয় দিন। উপোষ। কেউ কিছু খায়নি। নৃপেনও মরবে, মেয়েটাও মরবে। আপনারা সবাই রয়েছেন আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি।

—কী সিদ্ধান্ত?

—আমি বিয়ে দেব।

—কার সঙ্গে বিয়ে?

—বুড়োর সঙ্গে মাধুরীর।

'এত অল্প বয়সে বিয়ে? মাধুরী গত বছর মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চমাধ্যমিক পড়ছে। বুড়োর ফার্স্ট ইয়ার।'

'আমাদের ঠাকুর্দা এগারো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। ঠাকুরমার বয়স তখন পাঁচ। ঠাকুমা একদিন রেগে গিয়ে ঠাকুরদার কবজিতে কামড়ে

দিয়েছিলেন। সেই দাগ সারা জীবন ছিল। আমি বললুম, বিয়ে করবি না মানে? এটা কি তোর মামার বাড়ি?'

—মামার বাড়িই তো।

—এ মামার বাড়ি সে মামার বাড়ি নয়। বুড়োর আমি বিয়ে দেব। আমি ওই দৃশ্যটা ভুলতে পারছি না। শ্মশান থেকে ফিরে এসে দাঁড়ানো মাত্রই মাধুরী ছুটে এসে বুড়োর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। আমরা সবাই আছি, মাধুরী কিন্তু বুড়োকেই সবচেয়ে আপনার ভাবল। মাধুরীর মায়ের আত্মা আমার কানে কানে বলে গেল, এরা দুজন। আমার বিরাট পরিকল্পনা। কেউ আমাকে চা দিচ্ছে না কেন?

বলতে না বলতেই গান্ধারী চা নিয়ে এল। কদিন আগে রাসের মেলায় গিয়েছিল, বড়মামার জন্য চায়না একটা কাপ কিনে এনেছে। ঘোর বেগুনি রং। বড়মামা বলেছিলেন, ফ্যানটাস্টিক। তোর চয়েস আছে গান্ধারী।

চায়ে চুমুক দিয়ে বড়মামা বললেন, 'দুটো জীবন এক করার সঙ্গে সঙ্গে, দুটো বাড়িও এক করে দেব। বিরাট বড় একটা সুড়ঙ্গ কাটাব। এ বাড়ির এই ঘর থেকে নামবে, ও বাড়ির ওই ঘরে গিয়ে উঠবে। সেইরকম হাইট হবে। হামাগুড়ি নয়, কমফরটেবলি দাঁড়িয়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়া যাবে। পাকা টানেল। চাপা আলো। সফট্ মিউজিক। বর ওই টানেল দিয়ে যাবে। বর-কনে ওই টানেল দিয়ে আসবে।'

বড়মামা এক্সাইটেড। আমাকে বললেন, 'বিকাশ কো বোলাও। আজ বাদে কাল বিয়ে, লেটকে বসে আছিস, নির্লজ্জ বেহায়া।'

মাসিমা বললেন, 'যাদের বিয়ে তাদের একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। যুগ বদলেছে। কেউ কোথাও মন দিয়ে বসে আছে কি না।'

নিতুকাকু বললেন, বিয়েটা হবেই। তারপর হাসলেন। হাসিটা যেন কেমন।

বড়মামা বললেন, 'আজই পাঁচিলটা ভাঙা করাব।'

মাসিমা অবাক হলেন, 'কোন পাঁচিল?'

'আরে, আমার ঠাকুরদা আর মাধুরীর ঠাকুরদা গলায় গলায় বন্ধু ছিলেন। পাশাপাশি দুটো বাড়ি। এক সঙ্গে তৈরি। একই কনট্রাকটর। একটা বেড়ালের জন্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। দু-বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল উঠে গেল।'

—বেড়াল?

—ও বাড়ির ঠাকুরদা একটা কাবলি বেড়াল পুষেছিলেন। সেটা এ বাড়িতে চলে আসত। ঠাকুরমার আদরে সে আর ও বাড়িতে ফিরত না। এই নিয়ে অশান্তি বাড়তে বাড়তে পাঁচিল। পাঁচিল আমি ভাঙব।

বড়মামা ফোন তুললেন, 'হ্যালো। কী হল। তোমারও আঠারো মাসে বছর। আজই ভাঙতে হবে। আরে মন্দিরটা তো তৈরিই হল না। ভাঙবে কি? ভাঙতে হবে পাঁচিল। উত্তর দিকের লম্বা বাউন্ডারি ওয়াল। আমাদের পাঁচিল আমরা ভাঙব, কার বাবার কী? কুইক। জলদি। আর তুমিও চলে এস। একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করতে হবে। আরে টানেল, টানেল। টি. ইউ.নে.ল। তুমি এস না। অ্যাঁ, অ্যাঁ না করে।'

মাসিমা বললেন, 'পাঁচিলটা ভাঙা কি খুব জরুরি?'

—অফকোর্স। বিরাট একটা মাঠ বেরোবে। এদের ছেলে মেয়েরা খেলবে। দুটো গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুর কিনে দেব। এক ডজন টেনিস বল। একটা দোলনা বসিয়ে দেব। একটা স্লিপ। সবুজ ঘাস। ফুলের বেড দিয়ে ঘেরা। আর বাচ্চারা দৌড়চ্ছে। চিৎকার করছে। মাধুরী মা হয়েছে। গার্ডেন বেঞ্চে বসে কমলালেবু রঙের উলের সোয়েটার বুনছে। কুসি দিদা হয়েছে, আমি দাদু। মাধুরীর মেয়েরা বড় হবে। ভাল মিশনারী স্কুলে পড়বে। সাদা পোশাক, নীল প্যান্ট, সাদা মোজা, ঝকঝকে কালো জুতো।

মাসিমা বললেন, 'শুধু মেয়ে? ছেলে হবে না?'

—ছেলে? ছেলের কী দরকার? মেয়েই ভাল। সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে। খাঁড়া খাঁড়া নাক, টানা টানা চোখ সামান্য লালচে, সিংহের কেশরের মতো চুল। ছেলের কী দরকার। ভাল, ভাল জামাই। বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কুইক, কুইক, আমাদের একটা জায়গায় যেতে হবে।

জানি না, যাচ্ছি কোথায়! গাড়ি সাঁই সাঁই ছুটছে। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন জগন্নাথবাবু। মনে হয় কোনও ভগ্নপ্রাসাদ দেখতে যাওয়া হচ্ছে। দিনটা খুব ব্রাইট। চাঁপা ফুলের মতো শেষ দুপুরের রোদ। আমরা বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকের একটা ছোট রাস্তায় ঢুকলুম। বেশ বুঝতে পারছি, রাস্তাটা ঢালু হতে হতে ক্রমশই নিচের দিকে নামছে। লোকালয় কমে আসছে।

এপাশে, ওপাশে একটা দুটো নির্জন বাগান বাড়ি। কেউ থাকে না। অতীত লেগে আছে শ্যাওলার গায়ে। একটা বাড়ির একেবারে উপরের ছাদের আলসেতে জরাজীর্ণ একটা কাশ্মীরী কার্পেট ঝুলছে। কে কবে রোদে দিয়ে চলে গিয়েছে। সে আর ফিরে আসেনি।

জগন্নাথকাকু বললেন, এ সব লিটিগেটেড প্রপার্টি। কেসে ফেঁসে আছে। কত খুনখারাবি। ভাই ভাইয়ের বুকে গুলি হাঁকড়ে দিলে। ছেলে বাপের মাথায় শাবল চালিয়ে দিলে। স্ত্রী স্বামীকে বিষ খাইয়ে দিলে। একেই বলে বিষয় বিষ।

এই সব ভাল, ভাল প্রপার্টি পড়েই থাকবে। মামলা করতে করতে মরে যাবে, মামলাটা কিন্তু বেঁচে থাকবে।

রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল হঠাৎ। বেশ সুন্দর একটা মাঠ। একেবারে নির্জন। অনেকটা নিচে গঙ্গা একা একা বইছে। একঝাঁক শালিক পাখি মহা কলরবে চান করছে। কত কথা। মাঝে মধ্যে জেট প্লেনের মতো টিয়ার ঝাঁক তীব্র বেগে উড়ে যাচ্ছে।

বাঁ দিকের বাড়িটা বেশ বোঝা যায়, তৈরি হয়েছিল বিলিতি প্ল্যানে। মাথার উপরে গম্বুজটা একপাশে কাত। যতদূর মনে হয় ঝড়ের কাজ। বিশাল গেট কোনও সময় ছিল। এখন আর নেই। দাঁড়িয়ে আছে দুটো ভাঙা পিলার। মাঠের উপর অস্পষ্ট এক জোড়া রেললাইন। জায়গায় জায়গায় আছে, জায়গায় জায়গায় নেই।

জগন্নাথকাকু বললেন, রেললাইন নয়, কামানের লাইন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বাড়িটা হয়েছিল মিলিটারি বেস। গঙ্গার ধারে কামান বসেছিল।

এক সময় মোরাম বিছানো, কেয়ারি করা সুন্দর একটা পথ ছিল বোঝা যায়। এখন কিছুই নেই। শুধু আগাছা। দুপাশে বাগান ছিল। ফোয়ারা ছিল। ভাল, ভাল স্ট্যাচু ছিল। সে সব চুরি হয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে ভাঙা বেদী। মার্বেল সব খুলে নিয়ে গিয়েছে। বুনো লতা, ঝুপড়ি, গাছ, ঝরা পাতা। কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া, রহস্যময়। ঝোপের মধ্যে বিশাল বড় একটা কুবো পাখি ডাকছে। নিলামের হাতুড়ির শব্দের মতো।

আমার ভীষণ ভয় করছে। বড়মামার খুব আনন্দ। জগন্নাথকাকুকে বললেন, একটা রাত কাটালে কেমন হয়।'

দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়িটা কাঠ বলেই টিকে আছে। রেলিং ভেঙে পড়ে আছে, কাত হয়ে একপাশে। ক্যানভাসে আঁকা একটা অয়েল পেন্টিং বেঁকে ঝুলছে। ছবিটা কী বোঝার উপায় নেই।

সিঁড়িতে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। ভেঙে না পড়ে। দোতলায় বিশাল একটা হলঘর। ঢুকেই চমকে উঠেছি। একেবারে নতুন একটা সোফা। সব পুরনো ঝরঝরে, সোফাটা নতুন। বাদামি রং। নিখুঁত সাহেবি পোশাক পরে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। একেবারে বনেদী চেহারা। আমরা বিব্রত। বিনা অনুমতিতে এসে পড়েছি। বড়মামা তাঁর সেই ভুবন ভোলানো বিখ্যাত হাসি হেসে বললেন, 'এক্সকিউজ মি স্যার!'

কেউ নেই। সোফা একটা রয়েছে। সত্তর বছরের পুরনো। সব ভাঙা। সাত পুরু ধুলো, ঝুল। কোথায় সেই সাহেব? আমরা তিনজনে প্রায় জড়াজড়ি। কিছু বলার চেষ্টা করছি। শব্দ বেরোচ্ছে না। গঙ্গার দিক থেকে অকারণে উন্মাদ এক ঝটকা বাতাস এল। ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়ল। কোথাও অদ্ভুত একটা শব্দ হল, ক্যাঁচ।

পরক্ষণেই আমরা বাইরে। গঙ্গার ওপারে, সূর্য অস্তে নামছে। চারপাশ লালে লাল। রোজই হয়তো এইভাবেই সূর্য অস্ত যায়, আমার মনে হল, কেমন যেন! আকাশে আগুন লেগে গিয়েছে। কোথাও একটু বসা দরকার। গঙ্গার ধারের মাঠে একটা কালো কুকুর ঘুরছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কালো কুকুর কেন?

আমরা বসলুম। বড়মামা বললেন, 'তিনজনেই দেখলুম। দেখাটা মিথ্যা নয়। আমি ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য, বিশ্বাস করি না। রাত হলে কথা ছিল না, দুপুর বেলা ভূত।'

জগন্নাথকাকু বললেন, 'কোনও মানুষকে বলা যাবে না। বলবে, গাঁজা খেয়েছে।'

একটা নৌকা ভিড়ল। ঢালু পাড় বেয়ে মধ্যবয়সী একজন মানুষ অক্লেশে উঠে এলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথা থেকে?'

বড়মামা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি এখানে থাকেন?'

—থাকি না, রোজ আসি।

—ওই গম্বুজ বাড়িটা সম্পর্কে কিছু জানেন?

—ওখানে শেষ যিনি ছিলেন, তাঁর নাম ব্যারিস্টার বি. মিত্র। পাক্কা সাহেব। চাকরের হাতে খুন হয়েছিলেন। এখনও তিনি আছেন ওই বাড়িতে।

—আপনি কী করেন?

—আমি সিকিউরিটির লোক। ওই দিকে একটা বাড়িতে এক বৃদ্ধা থাকেন, আমি সারা রাত পাহারা দিই।

—বাঃ বাঃ খুব ভাল কাজ। আপনি বলশালী। বড়মামা বললেন।

লোকটি কোমরের কাছ থেকে একটা রিভলবার বের করে বললেন, এই আমার বল।

বড়মামা বললেন, 'কটা মেরেছো?'

—একটাও না। মানুষ মারা অত সহজ নয়।

লোকটি হন হন করে পুব দিকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আমরাও গাড়িতে উঠলুম। বিরাট বড় সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। মেটে সিঁদুরের মতো রং। গাড়ি খুব ধীরে চলছে। বাঁকের পর বাঁক। বড়মামাই চালাচ্ছেন। আমি সামনে। জগন্নাথকাকু পিছনে।

বড়মামা বললেন, 'চলুন, বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই।'

—কে বিজয়বাবু?

—বিখ্যাত মানুষ। ভূত নিয়ে রিসার্চ করেন।

—আবার ভূত?

—হচ্ছে যখন ভাল করেই হয়ে যাক।

গাড়ি গড় গড় করে যাচ্ছে। এক জায়গায় চা, তেলেভাজা খাওয়া হল। জগন্নাথকাকুর সেই এক দুশ্চিন্তা, অম্বল। বড়মামা বললেন, আমি কম্বল দিয়ে দেব। একটা অতি প্রাচীন বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ভাত খুব সেদ্ধ হলে যেমন ডেলা পাকিয়ে যায়, বাড়িটার ইটও সেইরকম ডেলা পাকিয়ে গিয়েছে। জানলা, দরজা সব শুকিয়ে খটখটে। সদর দরজা খোলাই ছিল। পঁচিশ পাওয়ারের আলোয় যতটা দেখা যায়। অনেক দূরে একটা উঠোন। একটা ঘরে চড়া আলো জ্বলছে। সেই আলোর পিচকিরি যেখানে এসে পড়েছে, সেখানে একটা হাঁড়িকাঠ। আলো জ্বলছে মায়ের মন্দিরে। মা কালী। মায়ের অমন মূর্তি কোথাও দেখিনি। মায়ের গায়ের রং দুধের মতো সাদা, আর মহাদেব কুচকুচে কালো। মায়ের সামনে আসনে বসে আছেন জবরদস্ত এক সাধক। মাথাটা জটা। দাড়ি ঝুলে আছে বুকে। হৃষ্টপুষ্ট। এতখানি ভুঁড়ি। ঠিক যেন মহাদেব। আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম। তিনি হাত তুলে বললেন, 'উল্লুক-হয়ে যেয়ো না ডাক্তার! তুমি অনেক দিন পরে এলে।'

'আমার কথা আর বলবেন না। আমি ক্রমশই উল্লুক হয়ে যাচ্ছি। আপনার কাছে ছুটে আসার কারণ, আজ দুপুরে আমরা তিনজনে ভূত দেখেছি।'

—ভূত পরে হবে, আগে বোসো।

আমরা ধুপ ধুপ করে বসে পড়লুম। তিনি বললেন, 'ভূত মারার কী? ভূত বলে কিছু নেই। তোমরা একটা অন্য ডাইমেনশনে চলে গিয়েছিলে।'

—কী করে গেলুম?

—যাবে কেন? তোমাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এটা কীরকম জানো, খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঢোকার মতো চাকার মতো। কত দুনিয়া ঘুরছে। একটাকে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে আর একটা। ওই কাটার বিন্দুতে

দাঁড়ালে, এটাও দেখা যায়, ওটাও দেখা যায়। এই জগৎ থেকে পা তুলে ওই জগতে ফেলা। অনেক রহস্য বাবা। সাধনা দ্বারা জানা যায় না।

বড়মামা বললেন, 'কতবার বললুম, একটু সাধন দিন। পড়ে দেখি। দিলেন না।'

—সময় হয়নি।

—এই তো মনটা খারাপ করে দিলেন।

—ডাক্তার! তুমিও তো সাধক! তোমার এক ধারা, আমার আর এক ধারা। পৃথিবীতে সকলেই সাধক। কেউ গুটোচ্ছে, কেউ ছাড়ছে।

—সেটা কীরকম?

—ঘুড়ি আর লাটাই। একই লাটাই, সুতো আর ঘুড়ি। দু-ধরনের প্যাঁচ খেলা। কেউ ছেড়ে খেলছে, কেউ টেনে খেলছে। কেউ নিজেকে গুটোচ্ছে, তখন কেবল আমি: আমার। কেউ নিজেকে ছেড়েই যাচ্ছে। আকাশ, আরও আকাশ। আমি বলে কিছুই আর থাকছে না। ডাক্তার! তোমার তো আমি, আমি নেই। তোমার চেয়ে বড় সাধক কোথায় মিলবে? আমিটাই তো ভূত।

বড়মামা বললেন, 'কী যে আমার প্রশংসা করেন আপনি। এইবার আমি সব ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসব।'

—ডাক্তার! এই জন্মটাও বৃথা গেল। শিবকে সাদা করতে হবে। ওই কালো তুলে কালীর গায়ে লাগিয়ে মাকে কালী করতে হবে। এ হল আত্মসাধনা।

এলো চুল, লম্বা চেহারার এক মহিলা এলেন। বড় বড় চোখ। ভীষণ দীপ্তি। কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে মন্দিরে মায়ের সামনে আসনে বসে পড়লেন। পিছনে কালো চুলের ঢেউ। এইবার পূজা আরতি শুরু হবে। আমার মনটা কেমন যেন করছে। কোথায় যেন চলে যাচ্ছি ভেসে ভেসে।

গভীর রাত। বাড়ি নিস্তব্ধ। দূর থেকে ভেসে আসছে নাক ডাকার একটানা শব্দ। একেবারে শেষ মাথায় হরিদার ঘর। সারাদিন খুব খাটেন। এই বাড়ির ম্যানেজার। মাসিমার ডান হাত। বালিশে মাথা ফেলা মাত্রই ঘুম। তারপর চলল ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিন ভোরের স্টেশন ধরতে। বাইরে দমকা বাতাস। বিরাট চাঁদ ফানুসের মতো ভাসছে। গাছের পাতার ঝাপুস-ঝুপুস শব্দ। গাছের মাথায় পাখির ছানা চিঁ চিঁ করে ডাকছে। আমার মাথার দুদিকে বড় বড় দুটো জানলা। ঘুম আসছে। মিষ্টি ঘুম। সারাদিনের সব ঘটনা ভেসে ভেসে আসছে। নীলের জগতে চলে যাচ্ছি। সব নীল। রুপালি মূর্তি সব। দেব, দেবী, মানুষ, পাখি। কারোরই ওজন নেই। সব ভাসমান।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। একটা অস্বস্তি। ঘরে কেউ এসেছে। আমি এক

ঘরের টকটকে লাল মেঝেতে পাতলা একটা ছায়া লুটিয়ে আছে। চাঁদের আলোয় বাইরেটা কাঁচের মতো হয়ে গিয়েছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ একটি মূর্তি। ভূত? দেবদূত! ভয় করছে। চাঁদের আলোয় তার পোশাক দুধের মতো সাদা। যেখানে সেখানে ভাঁজ সেখানে হালকা গোলাপি।

কে?

ফিরে তাকাল। মুখের একপাশে আলো, একপাশে ছায়া।

গান্ধারী! এত সুন্দরী!

গান্ধারী ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। খাটের ধারে আমার পা দুটো ঝুলছে। গান্ধারীর দুটো হাত আমার দু কাঁধে। ফসলের ভরা ক্ষেতের মতো তার বুক আমার মুখের সামনে। অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ। মধ্যরাত। চারপাশ নিদ্রিত। বাইরে নেশার মতো চাঁদের আলো। পাখির ছানার চিঁ চিঁ ডাক। রাতের গান্ধারী। গান্ধারীর রাত। তার এই রূপ আমি আগে দেখিনি। মেয়েরা রাতে রূপসী হয়। অদিতী!

দু-চোখে তার জল গড়াচ্ছে ভোরের শিশিরের মতো। দানা দানা, ফোঁটা ফোঁটে। গান্ধারী অদ্ভুত একটা কথা বললে, তুমি মাধুরীকেই বিয়ে কর। মাধুরীকেই বিয়ে কর। মাধুরীকে। মাধুরীকে। আর কিছু বলতে পারল না। তার গলা ধরে এল। আমি অবাক হয়ে তার মুখ দেখছি। এত কাছ থেকে কখনও দেখিনি। নাক, চোখ, ঠোঁট, চিবুক, গলা। নিজেকে ধরে রাখা আর সম্ভব হল না। এত কাছে। এত আপনার! মাটির মতো, নদীর মতো, আকাশের মতো, জলের বুকে নেমে আসা তারার মতো।

প্রথম জাগরণ। গান্ধারী আমার ঘুম ভাঙালে। চাঁদ চলে গেল আকাশ সীমায়। তারারা ফ্যাকাসে। প্রথম পাখির প্রথম ডাক। ভোরের মঙ্গল আরতি। গালে একটা চিহ্ন রেখে, শরীরে শরীরের উত্তাপ রেখে, মনে গভীর ছাপ ফেলে, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে গান্ধারী চলে গেল। তখনই জানলুম, সে কোন পথে এসেছিল। আমার পাশের ঘরে কেউ থাকে না। দু ঘরের মাঝখানে দরজা। দরজার ছিটকিনি ওপাশ থেকে তোলা। ওই দরজা খুলে সে এসেছিল।

এই ঘটনা তো গোপন করা যাবে না। গোপনীয়তাই পাপ। সবার আগে মাসিমাকে জানাতে হবে। তিনি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তারপর আর এক বন্ধু আমার বড়মামা। কাল রাতের ঘটনায় আমার ভূমিকা কতটুকু ঘটে গিয়েছে।

মাসিমা পায়রাদের দানা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। রোজ যা করেন।

—তুমি একটু বসো।

—কী হল, আমার কি এখন বসার সময় আছে রে?

—একটু সময় দিতেই হবে।

আমরা দুজনে বাগানের যে অংশটা সবচেয়ে নির্জন সেই জায়গায় গিয়ে বসলুম। যা ঘটেছে, অকপটে সব বললুম। সব, সব।

মাসিমা সব শুনে বললেন, বেশ হয়েছে। মাধুরীকে আমি ভালবাসি। ওর বাবা ভীষণ অহংকারী। ঘরের ছেলে, ঘরের মেয়ে ঘরেই থাক। ফাটল ধরিয়ে কাজ নেই। গান্ধারী খুব ভাল মেয়ে। সরল মেয়ে। ওর গোটা শরীরটা প্রেম দিয়ে তৈরি। রাধিকা ভাব। চল, বড়দার কাছে যাই।

বড়মামার হাতে বিরাট এক রুগি। ভোর রাত থেকে মেডিক্যাল জার্নালে ডুবে আছেন। কাপের পর কাপ চা। মাসিমা বললেন, বড়দা! গুরুতর একটা কথা আছে।

বড়মামা চোখ না তুলেই বললেন, 'রাতে গুরুপাক খেলেই সকালে গুরুতর অবস্থা হবে। আমার কিছু করার নেই। অনেকরকম ওষুধ আছে, একের পর এক চালিয়ে যাও।'

নাগের ডগায় রিডিং গ্লাস ঝুলছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে বড়মামাকে।

মাসিমা বললেন, পাঁচ মিনিট সময় দিলে একটা আত্মহত্যা আর হয় না।

আত্মহত্যা? বড়মামা ঘুরে বসলেন। সব শুনে বললেন, 'বলিস কী, আমার এত বড় ভাগ্য! মেয়েটাকে স্টেশন থেকে তুলে এনেছিলুম বুকে করে। মাধুরীকে হাজারটা ছেলে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তুত। আমার গান্ধারীকে বিয়ে করবে কোন গান্ধার?'

বড়মামা আমার দিকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো বললেন, 'বাবা! পাকা কথা তো। পরে ব্যাক আউট করবে না তো? না, আশীর্বাদটা সেরে রাখা যাক। কুসি! তুই হলি ছেলের তরফে। আর আমি হলুম মেয়ের তরফে। দেনা-পাওনার কথাটা হয়ে যাক।'

বড়মামা আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে আমার মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'বাবা! মেয়েটাকে দেখো। কষ্ট দিও না। বড় দুঃখী মেয়ে। জীবনের কাছ থেকে চোখের জল ছাড়া কিছুই পায়নি।'

উঠে গিয়ে নিজেই ফোন করলেন, 'হ্যালো বিকাশ! আই অ্যাম অ্যান এস। রাধা আর কৃষ্ণ দুটোই বাড়িতে মজুত। মন্দিরটাই কেবল ইনকমপ্লিট। না, না, পাঁচিল আর ভাঙাতে হবে না, সুড়ঙ্গও করতে হবে না। একটা ভাল সানাই। প্যান্ডেলের লোক নিয়ে, কাম শার্প।'